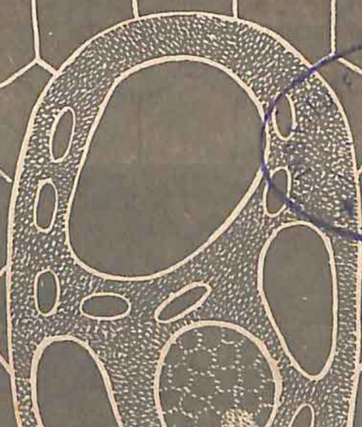
জীবন-বিজ্ঞান



কুণ্ডু • দাশ • কুণ্ডু

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education for Class IX, [Vide Board's Letter No. 10367/G, dated 24. 11. 75 and T.B./74/IX/L.S./24 dated 24. 11. 75]

জীবন-বিজ্ঞান

[প্রথম খণ্ড]

শ্রীমতী দেবী কুণ্ডু, এম. এস-সি., পি-এইচ. ডি.
গবেষিকা, ইম্পিরিয়াল ক্যান্সার রিসার্চ ফাণ্ড ;
প্রাক্তন গবেষণা-সহায়িকা, ইন্‌স্টিটিউট অফ অপ্‌থ্যাল্‌মোলজি (লণ্ডন) ;
প্রাক্তন গবেষিকা, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ;
জীব-বিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষিকা, বিনোদিনী গার্লস হাই স্কুল এবং
মুরলীধর গার্লস হাই স্কুল।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ, এম. এস-সি.
জীব-বিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষক, অক্ষয় শিক্ষায়তন (হাওড়া)।

শ্রীকল্যাণ কুমার কুণ্ডু, এম. এস-সি. (সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত), ডি. ফিল.
গবেষক, বেডফোর্ড কলেজ (লণ্ডন) ;
প্রাক্তন গবেষক, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ও ফলিত রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ;
প্রাক্তন অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ।

প্রাপ্তিস্থান :
ভারতী বুক স্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
6, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-9
IX—1

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি, 1974 ; অষ্টম (সংশোধিত) সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি, 1976।

মূল্য চার টাকা মাত্র

[ভারত সরকার-প্রদত্ত স্বল্পমূল্য কাগজে মুদ্রিত]

৭-বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, হইতে শ্রীপ্রবীরকুমার বারিক কর্তৃক প্রকাশিত ও
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, শান্তিনাথ প্রেস হইতে শ্রীজগন্নাথ পান কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নূতন পাঠ্যনির্ঘণ্টে জীব-বিজ্ঞানের চিরাচরিত রীতি পরিহার করে, জীবন-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে জীব-জগতের গতি-প্রকৃতি ও ধ্যান-ধারণা উপলব্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। পুস্তকটি পাঠ্যনির্ঘণ্টের এই ভাবধারার যথাযথ রূপায়ণের আন্তরিক প্রচেষ্টা। এই পুস্তকে সহজবোধ্য ভাষায় বিজ্ঞানের আধুনিক তথ্য পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু, সহজবোধ্যতার প্রয়োজনে তথ্য বিকৃত করা হয় নি।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের সময়, কয়েকজন দিক্‌পাল শিক্ষাবিদের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য পেয়েছি। এঁদের কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

সর্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার নিকট থেকে সবরকম সমালোচনা আশা করি।

কলিকাতা,
১লা জানুয়ারি, ১৯৭৪ সাল।

শ্রীমতী দেবী কুণ্ডু,
শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ,
শ্রীকল্যাণ কুমার কুণ্ডু।

SYLLABUS IN LIFE SCIENCE

CLASS IX

Life functions are to be dealt with reference to plants, animals and human beings to emphasise the similarities in the living organism.

1) Significance of Photosynthesis and Respiration.
   (Photosynthesis—8 pages
   Respiration—12 pages) [20 pages]
2) Nutrition, Metabolism and Digestion : Food, vitamins, enzyme, minerals & water [28 pages]
3) Circulation and blood [20 pages]
4) Movement and locomotion [20 pages]
5) Excretion [10 pages]
6) Soil, virus and microbes [10 pages]
7) Students should acquire individual experience by experimentation on the following items :—
   (a) Role of Nitrogen, Phosphorus and Potassium in growth in plants. Experiments on Respiration and Photosynthesis [7 pages]
   (b) Cockroach : alimentary canal, Toad—digestive system [5 pages]
   (c) Collection of life history stages of mosquito or butterfly [3 pages]
   (d) Effect of Physical exercises on Respiration and Circulation [2 pages]

[10% deviation allowed]

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

———

1

সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের তাৎপর্য
(Significance of Photosynthesis and Respiration)

বাঁচিয়া থাকার জন্য শক্তির প্রয়োজন। খাদ্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত থাকে। শ্বসনের ফলে, সঞ্চিত শক্তি তাপ-শক্তি-রূপে বাহির হয়। কাজেই, জীবনধারণের জন্য খাদ্যগ্রহণ এবং শ্বসন অপরিহার্য।

সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis)

উদ্ভিদেরা প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করে না—নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেদের দেহের মধ্যেই তৈয়ারি করিয়া নেয়। অতএব, ইহারা খাদ্য-বিষয়ে স্বনির্ভর। কিন্তু প্রাণীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদেরা কিভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে, সেবিষয়ে নিচের অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হইল।

উদ্ভিদেরা **সালোকসংশ্লেষ** বা **ফোটোসিন্থিসিস** (Photosynthesis) নামক এক বিশেষ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া (Physiological process)-র সাহায্যে জল এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড (Carbon dioxide) হইতে গ্লুকোজ (Glucose) নামক সরল শর্করা (Simple sugar) প্রস্তুত করে। গ্লুকোজ-ই উদ্ভিদ-দেহে সৃষ্ট প্রাথমিক খাদ্য।

ফোটোসিন্থিসিস কথাটি গ্রীক ফোটো (Photo) অর্থাৎ আলোক এবং সিন্থিসিস (Synthesis) অর্থাৎ সংশ্লেষ—এই দুইটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। আলোকের উপস্থিতিতে সংশ্লেষ হয় বলিয়া, ইহা সালোকসংশ্লেষ নামে পরিচিত। **অতএব, যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদেরা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সাহায্যে মাটি হইতে শোষিত জল এবং বায়ু হইতে গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্বারা গ্লুকোজ নামক খাদ্য তৈয়ারি করে, তাহাকে সালোকসংশ্লেষ বলা হয়।**

সালোকসংশ্লেষ-পদ্ধতি (Process of photosynthesis)

সবুজ পত্রই সালোকসংশ্লেষের প্রধান কেন্দ্রস্থল। সবুজ পত্রের মেসোফিল স্তর (Mesophyll layer)-এর কোষে গোলাকার অথবা দণ্ডের মতো অনেকগুলি

সজীব বস্তু থাকে। ইহাদের **ক্লোরোপ্লাস্টিড (Chloroplastids)** বলা হয়। ক্লোরোপ্লাস্টিডের মধ্যে **ক্লোরোফিল (Chlorophyll)** নামের সবুজ রঙ্গক (Pigment) কণা থাকে। উদ্ভিদ মূলরোমের সাহায্যে মাটি হইতে জল শোষণ করে। ঐ জল মূল, কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার জাইলেম (Xylem) কলার মধ্য দিয়া এবং পত্রের শিরা-উপশিরা (ইহারাও জাইলেম কলা)-র মধ্য দিয়া মেসোফিল স্তরে পৌছায়। পত্রের ত্বক (Epidermis)-এ **পত্ররন্ধ্র (Stomata)** নামের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রন্ধ্র থাকে। এই সমস্ত রন্ধ্রের মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডল হইতে পত্রের মধ্যে প্রবেশ করে।

সালোকসংশ্লেষের সময়, সূর্যালোক ও ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে ছয় অণু (Molecule) কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং বারো অণু জল হইতে এক অণু গ্লুকোজ, ছয় অণু জল এবং ছয় অণু অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। অতএব, সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক সমীকরণ (Chemical equation)—

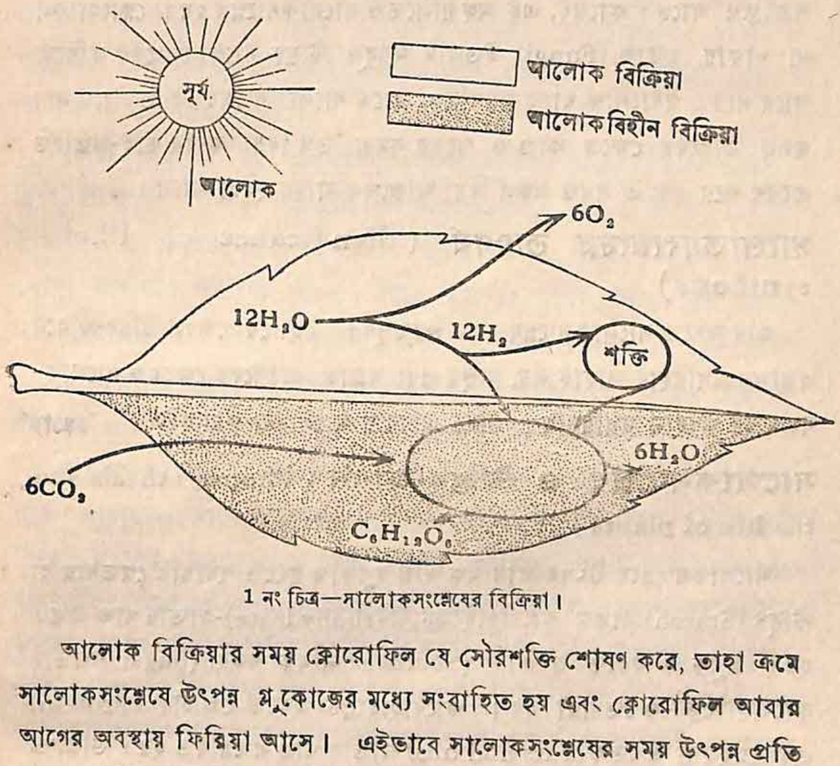
$$\underset{\text{কার্বন ডাই-অক্সাইড}}{6CO_2} + \underset{\text{জল}}{12H_2O} \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{জল}}{6H_2O} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{6O_2}$$

অবশ্য, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জল সরাসরি মিলিয়া গ্লুকোজ সৃষ্টি করে না। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি খুবই জটিল। অনেকগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়া একের পর এক ঘটিয়া অবশেষে গ্লুকোজ তৈয়ারী হয়। সালোকসংশ্লেষের সমস্ত বিক্রিয়াগুলিকে তুইটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্যায়ে, ক্লোরোফিল সূর্যালোক হইতে সৌরশক্তি (Solar energy) শোষণ করিয়া সক্রিয় (Activated) হইয়া উঠে। সক্রিয় ক্লোরোফিল তখন জলকে H^+ (হাইড্রোজেন আয়ন) এবং OH^- (হাইড্রক্সিল আয়ন)-এ বিশ্লিষ্ট করে। এই পর্যায়ের বিক্রিয়ায় সূর্যালোক অপরিহার্য। সেইজন্য. ইহাকে **আলোক বিক্রিয়া (Light reactions)** বলা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলিতে আলোকের প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য, ইহাদের **আলোকবিহীন বিক্রিয়া (Dark reactions)** বলা হয়। এই পর্যায়ে, হাইড্রোজেন আয়ন কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বিজারিত (Reduced) করে। ফলে, গ্লুকোজ এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। আলোক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন

হাইড্রক্সিল আয়নগুলি হইতে জল ও অক্সিজেন সৃষ্টি হয়। অক্সিজেন পত্ররন্ধ্র-পথে বায়ুমণ্ডলে চলিয়া যায়। সালোকসংশ্লেষের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলির ফলে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদ-দেহে সৃষ্ট গ্লুকোজ অণুর অঙ্গীভূত হয়। সেইজন্য, এই প্রক্রিয়াকে **অঙ্গার আত্তীকরণ (Carbon assimilation)**-ও বলে।



1 নং চিত্র—সালোকসংশ্লেষের বিক্রিয়া।

আলোক বিক্রিয়ার সময় ক্লোরোফিল যে সৌরশক্তি শোষণ করে, তাহা ক্রমে সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন গ্লুকোজের মধ্যে সংবাহিত হয় এবং ক্লোরোফিল আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়া আসে। এইভাবে সালোকসংশ্লেষের সময় উৎপন্ন প্রতি গ্রাম-অণু (Gram-molecule) গ্লুকোজ অর্থাৎ 180 গ্রাম গ্লুকোজের মধ্যে 673 কিলোগ্রাম-ক্যালরি (Kilogram-calorie) * শক্তি (সৌরশক্তি) স্থৈতিক শক্তি (Potential energy)-রূপে আবদ্ধ হয়।

সালোকসংশ্লেষের ফলে জল এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড—এই দুইটি সরল যৌগ হইতে গ্লুকোজ নামক অপেক্ষাকৃত জটিল যৌগ সংশ্লেষিত হয়। ইহাতে

* ক্যালরি (calorie) তাপের একক। এক গ্রাম (Gramme) জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করিতে যে পরিমাণ তাপ লাগে, তাহাকে ক্যালরি বলে। এক হাজার ক্যালরিকে এক কিলোগ্রাম-ক্যালরি বলা হয়।

উদ্ভিদের শুষ্ক ওজন (Dry weight) বাড়ে। এইরকম যে বিপাকের ফলে সরল যৌগ হইতে জটিল যৌগ সংশ্লেষিত হয়, তাহাকে উপচিতি (Anabolism) বলে। অতএব, সালোকসংশ্লেষ উপচিতির অন্যতম উদাহরণ।

কেবল সবুজ পত্রই নয়, উদ্ভিদের কচি কাণ্ডের সবুজ অংশ, পুষ্পের সবুজ বৃতি এবং কাঁচা ফলের সবুজ ফলত্বকেও ক্লোরোফিল থাকে। এই সমস্ত উদ্ভিদ-অঙ্গে পত্ররন্ধ্রও আছে। কাজেই, এই অঙ্গগুলিতেও সালোকসংশ্লেষ হয়। ক্লোরোফিল না থাকায়, ছত্রাক (Fungi) ইত্যাদি অসবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ করিতে পারে না। সূর্যালোক থাকে না বলিয়া, রাত্রে সালোকসংশ্লেষ হইতে পারে না। জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কাণ্ড ও পত্রের সমগ্র তল দিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রবেশ করে এবং ঐ সমস্ত অঞ্চল দিয়া অক্সিজেন বাহির হইয়া আসে।

সালোকসংশ্লেষের তাৎপর্য (Significance of Photosynthesis)

জীব-জগতে সালোকসংশ্লেষ চরম গুরুত্বপূর্ণ। ইহা যে কেবল উদ্ভিদ-জীবনে একান্ত অপরিহার্য তাহাই নয়, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও সালোকসংশ্লেষের অবদান অপরিসীম। নিচে এবিষয়ে আলোচনা করা হইল।

সালোকসংশ্লেষ ও উদ্ভিদ-জীবন (Photosynthesis and the life of plants)

সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন প্রাথমিক খাদ্য গ্লুকোজ হইতে সরাসরি শ্বেতসার বা স্টার্চ (Starch) নামক কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate)-জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। গ্লুকোজ হইতে সুক্রোজ (Sucrose) নামক শর্করা (Sugar)-জাতীয় কার্বোহাইড্রেট-ও তৈয়ারী হয়। কার্বোহাইড্রেট হইতে প্রোটীন (Protein) এবং স্নেহদ্রব্য ও তৈল (Fats and oils)-জাতীয় খাদ্য সংশ্লেষিত হয়। উদ্ভিদের দেহে উৎপন্ন এই সমস্ত খাদ্যের বেশির ভাগই উদ্ভিদের নিজস্ব পুষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়। উদ্বৃত্ত খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চিত থাকে। বংশ-বৃদ্ধির সময় ভ্রূণ ও শিশু-উদ্ভিদ এই সমস্ত সঞ্চিত খাদ্যে পুষ্ট হয়; অথবা, ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিকূল অবস্থায় পরিণত উদ্ভিদও সঞ্চিত খাদ্যের সাহায্যে পুষ্টিলাভ করে। প্রোটীন প্রোটোপ্লাজ্‌ম (Protoplasm) গঠন করে। কাজেই, ইহাদের সাহায্যে দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি হয়। সেলুলোজ (Cellulose) নামক কার্বোহাইড্রেট-ও শর্করা হইতে তৈয়ারী হয়। ইহার দ্বারা উদ্ভিদের কোষ-প্রাচীর (Cell wall) গঠিত হয়। উদ্ভিদের বিপাকে নিয়মিত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উৎসেচক বা এন্‌জাইম

(Enzymes) এবং হর্‌মোন (Hormones)-ও পরোক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন হয়।

সালোকসংশ্লেষ ও খাদ্য-শৃঙ্খল (Photosynthesis and food chain)

আগে বলা হইয়াছে, প্রাণীরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈয়ারি করিতে পারে না। সেইজন্য, ইহারা সমগ্র উদ্ভিদ, অথবা সালোকসংশ্লেষের ফলে উদ্ভূত উদ্ভিদ-দেহে সঞ্চিত খাদ্য খাইয়া জীবনধারণ করে। এই হিসাবে, উদ্ভিদকে **খাদ্যের উৎপাদক (Food producer)** বলা হয়। প্রাণীদের ভূমিকা **খাদক (Consumer)**-রূপে।

খাদক প্রধানতঃ দুই ধরনের—**প্রত্যক্ষ খাদক** (Direct consumer) এবং **পরোক্ষ খাদক** (Indirect consumer)। যে প্রাণীরা সরাসরি উদ্ভিজ্জ খাদ্যে পুষ্ট হয়, তাহাদের প্রত্যক্ষ খাদক বলে। ফড়িং, পঙ্গপাল, আরসোলা, প্রজাপতি ইত্যাদি পতঙ্গ ; ইঁদুর, খরগোস, হরিণ, গরু, মহিষ প্রভৃতি এই ধরনের খাদক। ইহারা সকলেই তৃণভোজী (Herbivorous)। তৃণভোজী প্রাণীরা সরাসরি সালোকসংশ্লেষ-প্রস্তুত খাদ্য হইতে শক্তি সংগ্রহ করে। সেইজন্য, ইহাদের প্রথম সারির খাদক (First order consumer) বলা হয়।

প্রত্যক্ষ খাদক ছাড়া, অন্য সমস্ত প্রাণী পরোক্ষ খাদকের অন্তর্গত। পরোক্ষ খাদক সাধারণতঃ মাংসাশী (Carnivorous)। ব্যাঙ, টিকটিকি ইত্যাদি প্রাণী বিভিন্ন ধরনের তৃণভোজী পতঙ্গ খায়। সুতরাং, ব্যাঙ দ্বিতীয় সারির খাদক (Second order consumer)। আবার, সাপের অন্যতম খাদ্য ব্যাঙ। সুতরাং, সাপ তৃতীয় সারির খাদক (Third order consumer)। ময়ূর চতুর্থ সারির খাদক (Fourth order consumer) ; কারণ, সাপ ইহার খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে, খাদ্যের উৎপাদক (উদ্ভিদ) হইতে আরম্ভ করিয়া ধাপে ধাপে নানাধরনের খাদকের সৃষ্টি হয়। ইহাকে **খাদ্য-শৃঙ্খল (Food chain)** বলে। খাদ্য-শৃঙ্খল জটিল, এবং নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত।

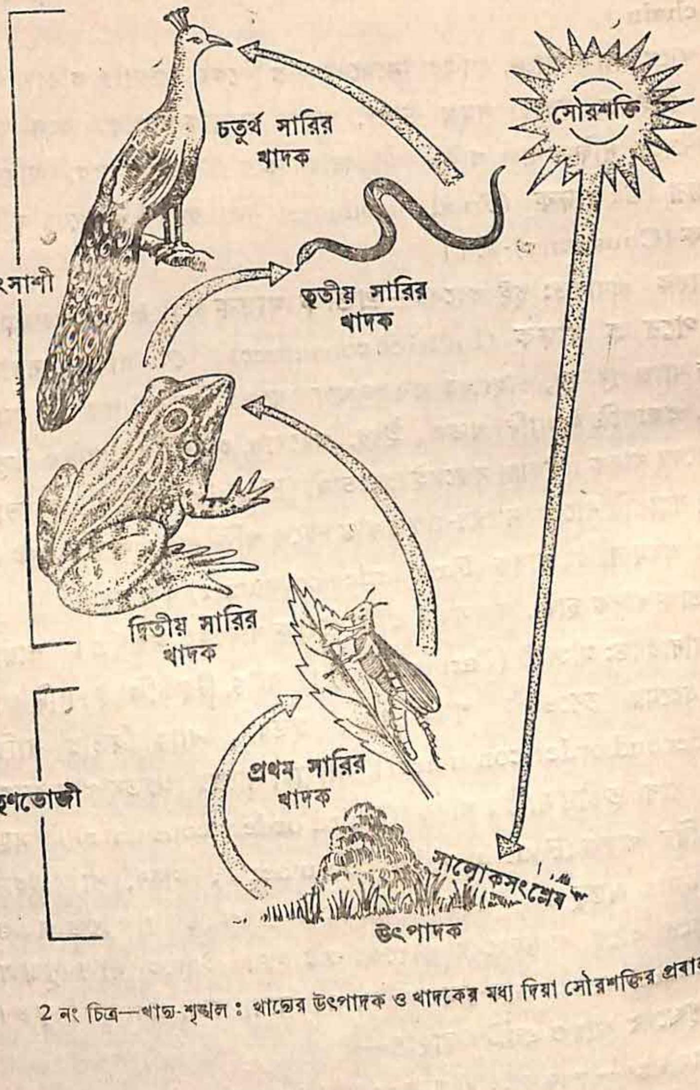
খাদ্য-শৃঙ্খলের আরও একটি উদাহরণ—

জলজ উদ্ভিদ → জলজ তৃণভোজী পতঙ্গ → ব্যাঙাচি → মাছ → ভোঁদড়

একটি সংক্ষিপ্ত খাদ্য-শৃঙ্খলের উদাহরণ—

তৃণ → হরিণ → বাঘ

খাদ্য-শৃঙ্খলের সমস্ত শাখার শুরু হয় সালোকসংশ্লেষকারী উদ্ভিদ হইতে এবং শাখার শেষ সারির খাদকের মৃত্যু ও বিনাশে উহার শেষ হয়। খাদ্য-শৃঙ্খলের



2 নং চিত্র—খাদ্য-শৃঙ্খল : খাদ্যের উৎপাদক ও খাদকের মধ্য দিয়া সৌরশক্তির প্রবাহ।

মধ্য দিয়া সৌরশক্তি উৎপাদক মারফত বিভিন্ন সারির খাদকের মধ্যে পরিবাহিত হইয়া থাকে।

উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্টতঃ দেখা যায়, প্রাণি-রাজ্য প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে খাদ্য এবং শক্তির জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। এই নির্ভরতা প্রধানতঃ সালোকসংশ্লেষকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত। কাজেই, জীবজগতে সালোকসংশ্লেষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সালোকসংশ্লেষ ও মানুষের খাদ্য (Photosynthesis and food of man)

সারা পৃথিবীর সাড়ে তিনশ' কোটি মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকার বেশির ভাগ অংশ জুড়িয়া আছে উদ্ভিদ-জাত খাদ্য। গমের মোট বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় ছয় লক্ষ কোটি বুশেল (Bushel), ধান ও ভুট্টা উৎপন্ন হয় প্রায় ঐ পরিমাণে। সালোকসংশ্লেষের ফলে প্রতি বছর জলজ ও স্থলজ উদ্ভিদ সম-অনুপাতে মোট প্রায় এক হাজার টন শর্করা উৎপন্ন করে। জলজ ও স্থলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে শতকরা প্রায় দুই ভাগ এবং দশ ভাগ শর্করা মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। আখের চিনি এই শেষোক্ত ধরনের শর্করার এক সামান্য অংশ-মাত্র। ইহারই উৎপাদন বছরে পঞ্চাশ লক্ষ টন। বলা বাহুল্য, এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী সবই সালোকসংশ্লেষের ফলে উদ্ভূত। গোল-আলুর পরিবর্তিত কাণ্ডে এবং রাঙা-আলুর পরিবর্তিত মূলে যে শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য সঞ্চিত থাকে, তাহাও সালোকসংশ্লেষের অবদান। ছোলা, মটর, মুগ প্রভৃতি ডা'ল-জাতীয় বীজে সঞ্চিত প্রোটীন-জাতীয় খাদ্য এবং নারিকেল, বাদাম, সরিষা ও তিল ইত্যাদি তৈলবীজে সঞ্চিত স্নেহদ্রব্য ও তৈল (Fats and oils)-জাতীয় খাদ্যও পরোক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন হয়। জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের ভাইটামিন (Vitamins)-এর অধিকাংশই পরোক্ষ-ভাবে সালোকসংশ্লেষের ফলে সংশ্লেষিত হয়।

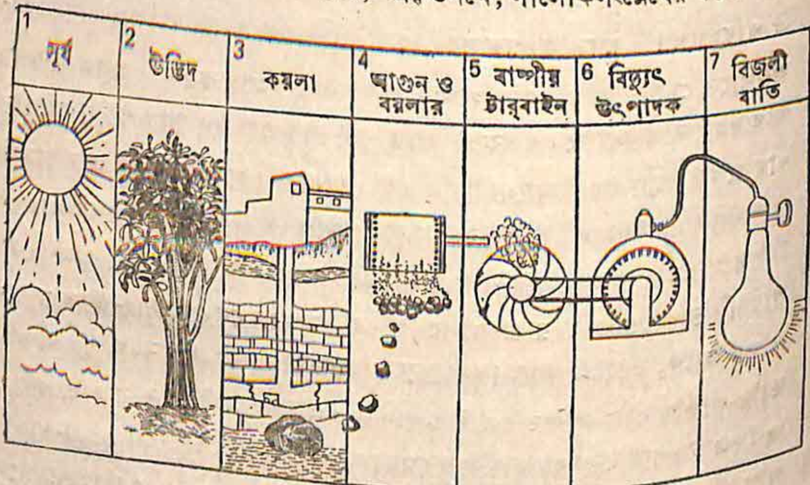
সালোকসংশ্লেষের অন্যান্য উপযোগিতা (Other uses of photosynthesis)

তুলা এবং রেয়ন (Rayon) নামক কৃত্রিম বস্ত্রের উপাদান মূলতঃ সেলুলোজ নামক কার্বোহাইড্রেট। ক্যামেরার ফিল্ম (Film), সেলোফেন (Cellophane) নামক স্বচ্ছ কাগজ সেলুলোজ হইতে তৈয়ারি হয়। কাগজ-শিল্পে ব্যবহৃত কাঠ ও বাঁশ, প্রকৃতপক্ষে, সেলুলোজ। সেলুলোজ সালোকসংশ্লেষের দ্বারা উৎপন্ন হয়।

গঁদ (Gum) ও রজন (Resin) নামক প্রয়োজনীয় সামগ্রী জটিল কার্বোহাইড্রেট-বশেষ। ইহারাও সালোকসংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন হয়।

কতকগুলি অতি-প্রয়োজনীয় ঔষধও উদ্ভিদ-জাত এবং পরোক্ষভাবে সালোক-সংশ্লেষের সঙ্গে যুক্ত। কুইনিন (Quinine), বেলেডোনা (Belladonna), এমিটিন (Emetine), মর্‌ফিন (Morphine) ইত্যাদির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান সভ্য জগতে তাপ ও শক্তির প্রধান উৎস এবং শিল্পে ব্যবহৃত দুইটি অপরিহার্য ইন্ধন (Fuel)—কয়লা ও পেট্রোলিয়াম (Petrolium) যথাক্রমে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের অবদান। প্রায় তিন হাজার লক্ষ বছর আগে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সেই সময়কার উদ্ভিদ-রাজ্যের বেশ কিছু অংশ এক বিশেষ ধরনের জীবাশ্ম(Fossil)-এ পরিণত হয়। এই জীবাশ্মই কয়লা। কয়লার মধ্যে সঞ্চিত শক্তি, প্রকৃতপক্ষে, সালোকসংশ্লেষের ফলে আবদ্ধ



3 নং চিত্র—সালোকসংশ্লেষের ফলে সৌরশক্তির প্রবাহ।

সৌরশক্তিই। পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural gas) প্রধানতঃ প্রাণীর এবং ক্ষেত্রবিশেষে উদ্ভিদের মৃত্যু ও পচনের ফলে সৃষ্টি হইয়াছিল।

সূর্যই সকল শক্তির উৎস। ক্লোরোফিল সেই অদ্বিতীয় পরমাশ্চর্য বস্তু, যাহা সৌরশক্তি গ্রহণ করিয়া সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন খাদ্যে পরিবাহিত করে। উৎস (সূর্য) হইতে (খাদ্যে) সংগৃহীত এই শক্তি জীব-জগতের ক্রিয়াশীলতা বজায় রাখে।

সালোকসংশ্লেষের শর্ত (Condition of photosynthesis)

সালোকসংশ্লেষ কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভর করে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি শর্ত বাহ্য, অন্যগুলি অভ্যন্তরীণ।

বাহ্য শর্ত (External conditions)

(1) **আলোক** (Light)—আলোক ছাড়া সালোকসংশ্লেষ হয় না। অন্যান্য শর্ত প্রয়োজনমতো থাকিলে, আলোকের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সালোকসংশ্লেষের হার বৃদ্ধি পায়। অবশ্য, প্রখর সূর্যালোকে ক্লোরোফিল নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় বলিয়া, সালোকসংশ্লেষে ব্যাঘাত হয়। আবার, ক্ষীণ আলোকে গ্লুকোজ শ্বেতসারে পরিবর্তিত হইতে পারে না। সুতরাং ঐ সময়েও সালোকসংশ্লেষের হার কমিয়া যায়।

(2) **কার্বন ডাই-অক্সাইড** (Carbon dioxide)—কার্বন ডাই-অক্সাইড সালোকসংশ্লেষের আর একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। বায়ুতে সাধারণতঃ শতকরা 0·03 ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে। অন্যান্য শর্ত অনুকূল থাকিলে, এবং বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ 0·01% অথবা তাহারও বেশি হইলে, সালোকসংশ্লেষের হার বৃদ্ধি পায়। অবশ্য, এই গ্যাসের খুব বেশি প্রাচুর্য হইলে, সালোকসংশ্লেষ বন্ধ হইয়া যায় এবং বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

(3) **জল** (Water)—সালোকসংশ্লেষের জন্য জল অপরিহার্য। জল বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন আয়ন গঠন করে এবং হাইড্রোজেন আয়ন কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বিজারিত করে। অবশ্য, মূল দিয়া শোষিত জলের শতকরা মাত্র এক ভাগ সালোকসংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়।

(4) **উষ্ণতা** (Temperature)—0° সেন্টিগ্রেডের কম উষ্ণতা হইতে 45° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি সব উষ্ণতায় কম-বেশি সালোকসংশ্লেষ হয়; তবে সচরাচর 35° হইতে 37° উষ্ণতাই সালোকসংশ্লেষের পক্ষে ভালো। অন্যান্য শর্ত অনুকূল থাকিলে, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে, উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সালোকসংশ্লেষের হারও বাড়িয়া যায়।

অভ্যন্তরীণ শর্ত (Internal conditions)

(5) **ক্লোরোফিল** (Chlorophyll)—ক্লোরোফিল সালোকসংশ্লেষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ শর্ত। সক্রিয় ক্লোরোফিল জলকে বিশ্লিষ্ট করে।

(6) **পত্ররন্ধ্রের ছিদ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি** (Increase and decrease of the stomatal aperture)—সালোকসংশ্লেষের সময় পত্ররন্ধ্রের ছিদ্রের মধ্য দিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড পত্রে প্রবেশ করে। ফলে, ছিদ্রের পরিধির কম-বেশি হওয়ার উপর কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রবেশ নির্ভর করে।

শ্বসন (Respiration)

বাষ্প-চালিত ইঞ্জিনের অব্যাহত গতির জন্য কয়লা প্রয়োজন। কয়লার মধ্যে তাপশক্তি নিহিত থাকে। কয়লার দহনে এই শক্তি নির্গত হয় এবং ইঞ্জিনকে চালিত করে। জীব-দেহকে বাষ্প-চালিত ইঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। আগে বলা হইয়াছে, জীবের শক্তির উৎস খাদ্য। দহনের ফলে খাদ্যের মধ্যস্থ শক্তি নির্গত হয় এবং জীবের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রিত করে। জীব-দেহে খাদ্যের দহনের আর এক নাম **শ্বসন** (Respiration)। শ্বসন জীবনের অন্যতম ধর্ম।

বস্তুতঃপক্ষে, সমস্ত জীবিত কোষেই সব সময় শ্বসন হয়। শ্বসন একরকম জারণ (Oxidation বিক্রিয়া। শ্বসনের ফলে কোষের মধ্যস্থ সঞ্চিত খাদ্য জারিত হইয়া, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং তাপশক্তি নির্গত করে। শ্বসনে জটিল খাদ্যের অণু ভাঙিয়া জল এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নামক অপেক্ষাকৃত সরল যৌগের অণু উৎপন্ন হয় এবং জীবের শুষ্ক ওজন কমিয়া যায়। সেইজন্য, শ্বসন একরকম **অপচিতি** (Catabolism)। নিচে শ্বসনের সংজ্ঞা দেওয়া হইল—

যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কোষের মধ্যস্থ খাদ্য জারিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত করে এবং খাদ্যের স্থৈতিক শক্তি মুক্ত করে তাহাকে শ্বসন বলে।

শ্বসনের পদ্ধতি (Process of respiration)

জীব-দেহের বিভিন্ন রকম খাদ্যের মধ্যে সচরাচর সরল শর্করা-জাতীয় খাদ্য (যেমন, গ্লুকোজ)-ই শ্বসনে অংশ গ্রহণ করে। অতএব, শ্বসনের রাসায়নিক সমীকরণ—

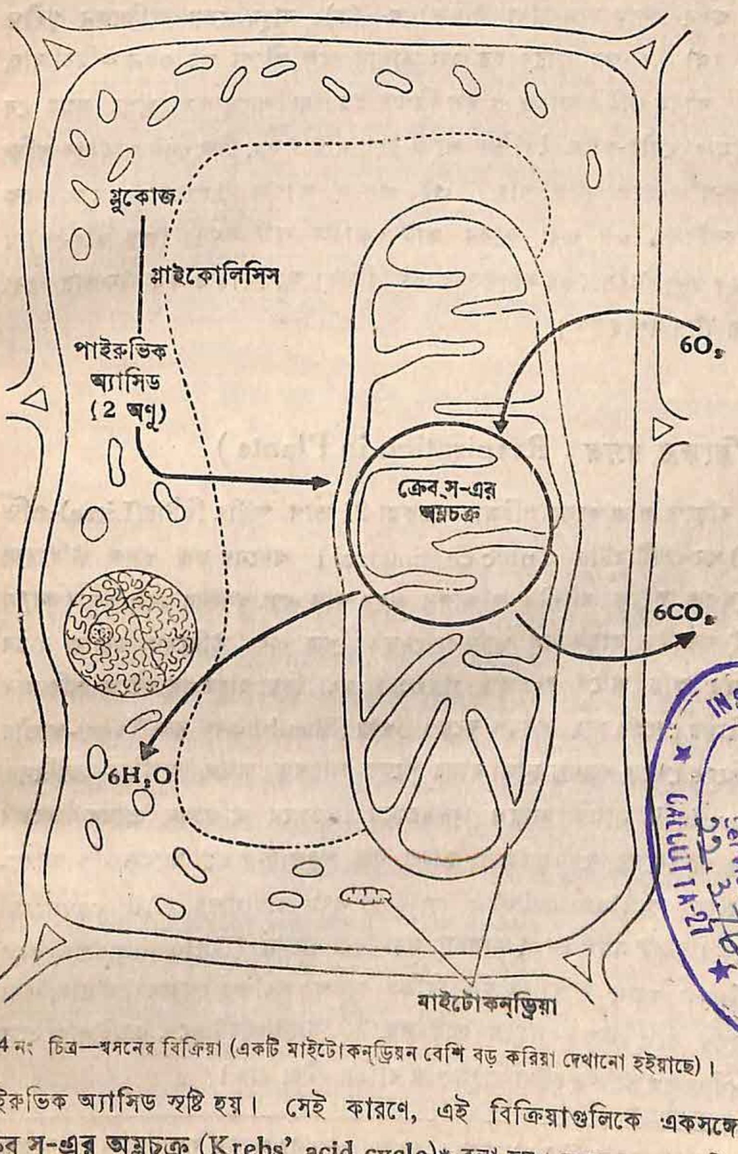
$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightleftharpoons 6CO_2 + 6H_2O + \text{তাপশক্তি}$$

গ্লুকোজ অক্সিজেন কার্বন ডাই-অক্সাইড জল

সালোকসংশ্লেষে এক গ্রাম-অণু গ্লুকোজে যে পরিমাণ শক্তি (673 কিলোগ্রাম-ক্যালরি) সঞ্চিত হয়, শ্বসনে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি বাহির হইয়া আসে।

শ্বসনের বিক্রিয়াগুলি দুইটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলিতে কয়েক ধরনের বিশেষ উৎসেচকের সাহায্যে গ্লুকোজ **পাইরুভিক অ্যাসিড** (Pyruvic acid) নামক সরল জৈব অ্যাসিড (Organic acid)-এ পরিণত হয়। এই পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলিকে একসঙ্গে **গ্লাইকোলিসিস** (Glycolysis) বলে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পাইরুভিক অ্যাসিড অন্য একধরনের কতকগুলি উৎসেচকের সাহায্যে অক্সিজেন দ্বারা জারিত হইয়া নানারকম জৈব অ্যাসিড সৃষ্টি করে। জৈব অ্যাসিডগুলি একটির পর একটি তৈয়ারি হয়। সবশেষে আবার



4 নং চিত্র—শ্বসনের বিক্রিয়া (একটি মাইটোকন্‌ড্রিয়ন বেশি বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে)।

পাইরুভিক অ্যাসিড সৃষ্টি হয়। সেই কারণে, এই বিক্রিয়াগুলিকে একসঙ্গে **ক্রেব স-এর অম্লচক্র (Krebs' acid cycle)*** বলা হয়। অম্লচক্র চলাকালীন অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় (4 নং চিত্র)।

গ্লাইকোলিসিস কোষের সাইটোপ্লাজ্‌ম(Cytoplasm)-এ এবং ক্রেব্‌স-এর অম্লচক্র* কোষের অন্তর্গত মাইটোকন্‌ড্রিয়া (Mitochondria)† নামক একধরনের সজীব বস্তুর মধ্যে ঘটে।

শ্বসন-প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে—(ক) বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন গৃহীত হয়, (খ) খাদ্যের জারণ হয় এবং তাহার ফলে জীবের শুষ্ক ওজন কমিয়া যায়, (গ) কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল নির্গত হয় এবং সালোকসংশ্লেষের সময় যে পরিমাণ সৌর-শক্তি স্থৈতিক শক্তি-রূপে সঞ্চিত হয়, ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি তাপ-শক্তি-রূপে মুক্তি পায়। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য, গ্লুকোজকে পোড়াইলেও জল এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয়। কিন্তু জীব-কোষে অনেকগুলি উৎসেচকের সহায়তায় এই বিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতায় এবং ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়।

উদ্ভিদের শ্বসন (Respiration in Plants)

বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা 21 ভাগ, অর্থাৎ লিটার(Litre)-প্রতি 210 ঘন-সেন্টিমিটার (Cubic centimetre)। শ্বসনের জন্য স্থলজ উদ্ভিদেরা বায়ুমণ্ডল হইতে গ্যাসীয় অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং শ্বসনের ফলে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছাড়িয়া দেয়। পত্র এবং উদ্ভিদের অন্যান্য বায়ব অঙ্গের কচি অংশে অবস্থিত পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়া বায়ুমণ্ডল হইতে অক্সিজেন উদ্ভিদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। গুল্ম (Shrub) এবং বৃক্ষ(Tree)-জাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পত্ররন্ধ্র ছাড়া বায়ব অঙ্গের পরিণত অংশে অবস্থিত লেন্টিসেল (Lenticel) নামক আরও একধরনের ছিদ্রপথে অক্সিজেন প্রবেশ করে। উদ্ভিদের দেহের মধ্যে গ্যাস চলাচলের জন্য পরস্পর-সংলগ্ন অনেকগুলি আন্তঃ-কোষীয় রন্ধ্র (Intercellular spaces) এবং বায়ু-গহ্বর (Air cavities) থাকে। এই সমস্ত ফাঁকা জায়গার মধ্য দিয়া ব্যাপন (Diffusion) পদ্ধতিতে অক্সিজেন গ্যাস উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত কোষে পৌঁছায়, এবং শ্বসনের ফলে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস একই পথে, একই পদ্ধতিতে বিপরীতমুখে চালিত হইয়া বায়ুমণ্ডলে বাহির হইয়া যায়।

---

* বিজ্ঞানী ক্রেব্‌স (Krebs) সর্বপ্রথম জৈব অ্যাসিডগুলির অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। সেইজন্য ইহাকে ক্রেব্‌স-এর অম্লচক্র বলে।

† বহুবচন ; মাইটোকন্‌ড্রিয়ন (Mitochondrion) —একবচন।

জলে নিমজ্জিত উদ্ভিদেরা দেহের প্রায় সমগ্র তল দিয়া জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন (শতকরা 0·7 ভাগ অর্থাৎ প্রতি লিটারে 7 ঘন-সেন্টিমিটার) গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস জলে ছাড়িয়া দেয়। এককোষী জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও একইভাবে গ্যাসের আদান-প্রদান হয়।

প্রাণীদের শ্বসন (Respiration in animals)

শ্বসনে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সংগ্রহের জন্য প্রায় সব প্রাণীর দেহে শ্বাস-যন্ত্র (Respiratory organs) নামক একধরনের বিশিষ্ট যন্ত্র থাকে। স্থলজ প্রাণীরা শ্বাস-যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন গ্রহণ করে ; জলজ প্রাণীরা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সাহায্যে শ্বসন করে। বিভিন্ন প্রাণীর শ্বাস-যন্ত্র দেখিতে বিভিন্ন ধরনের হইলেও, সমস্ত প্রাণীর শ্বাস-যন্ত্রের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ থাকে। যেমন—

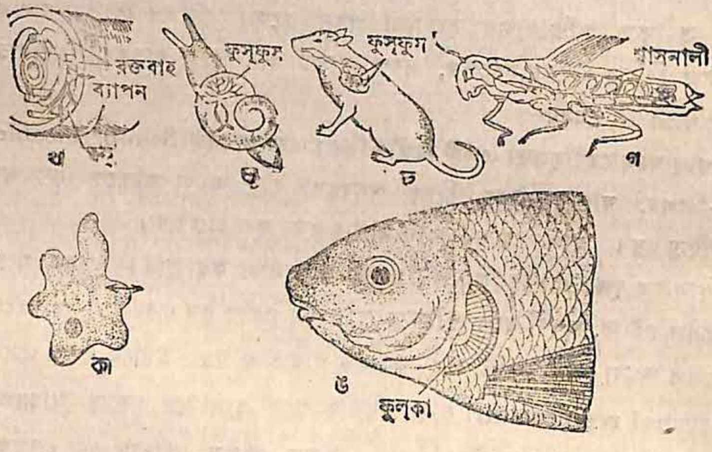
শ্বাস-যন্ত্রমাত্রেই মূলতঃ একটি বিস্তীর্ণ ভিজা এবং আভেদ্য(Semipermeable) পর্দা-বিশেষ, যাহার উপর দিয়া অনবরত বায়ু অথবা অক্সিজেন-যুক্ত জল প্রবাহিত হয়। শ্বাস-যন্ত্রে খুব বেশি-মাত্রায় রক্ত সংবরাহ হয়।

শ্বাস-যন্ত্র-যুক্ত প্রাণীর শ্বসনে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তরে, বায়ুমণ্ডল হইতে, অথবা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং শ্বাস-যন্ত্র হইতে বায়ুমণ্ডল অথবা জলে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যক্ত হয়। ইহাকে **বাহ্য শ্বসন (External respiration)** বলে। দ্বিতীয় স্তরে, শ্বাস-যন্ত্রে গৃহীত অক্সিজেন সাধারণতঃ রক্ত-বাহিত হইয়া দেহের কোষে কোষে পৌছায় এবং কোষের শ্বসনে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড রক্তে বাহিত হয়। শ্বসনের এই স্তরকে **আভ্যন্তরীণ শ্বসন (Internal respiration)** বলা হয়। শ্বসনের তৃতীয় স্তরে, 10 হইতে 12 পৃষ্ঠায় বর্ণিত পদ্ধতিতে অক্সিজেন কোষের মধ্যস্থ খাদ্যকে জারিত করিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন করে এবং শক্তি নির্গত হয়।

শ্বসনের কৌশল (Mechanism of respiration)

10 হইতে 12 পৃষ্ঠায় বর্ণিত শ্বসনের পদ্ধতি জীব-জগতের সর্বক্ষেত্রেই একই-রকম। প্রধানতঃ শ্বাস-যন্ত্রের গঠনের তারতম্যের জন্য, বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে পরিবেশ (বায়ু ও জল) হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ এবং দেহ হইতে পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগের পদ্ধতির তারতম্য দেখা যায়। এই অনুযায়ী, বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের শ্বসনের কৌশল দেখা যায়। পরের কয়েকটি পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা করা হইল।

(ক) **সরাসরি ব্যাপনের দ্বারা** (By simple diffusion)—অনেক জলজ প্রাণী সরাসরি দেহের সমগ্র তল দিয়া জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন দেহের মধ্যে গ্রহণ করে এবং দেহস্থ কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে ছাড়িয়া দেয় (6 নং চিত্র-ক)। ইহাদের দেহে কোনও বিশিষ্ট (Specialised) শ্বাস-যন্ত্র থাকে না। অ্যামিবা (*Amoeba*) এবং অন্যান্য জলজ এককোষী প্রাণীর ক্ষেত্রে কোষ-পর্দা (Cell membrane)-র মাধ্যমে গ্যাসের আদান-প্রদান হয় (5 নং চিত্র-ক)। স্পঞ্জ (Sponges), একনালীদেহী প্রাণী (Coelenterates) এবং চ্যাপ্টা কৃমি (Flat worms) প্রভৃতি জটিলতা-বর্জিত নরম ও ছোট জলজ প্রাণীর দেহের পরিধিতে



5 নং চিত্র—প্রাণীদের শ্বসন-কৌশলের প্রকারভেদ : ক. সরাসরি ব্যাপনের দ্বারা (অ্যামিবা) ; খ. ব্যাপন ও রক্তের সাহায্যে (কেঁচো) ; গ. শ্বাসনালী দ্বারা (পতঙ্গ) ; ঘ. ফুসফুস দ্বারা (শামুক) ; ঙ. ফুলকা দ্বারা (মাছ) ; চ. ফুসফুস দ্বারা (ইঁদুর)।

অবস্থিত কোষগুলির মাধ্যমে ব্যাপনের দ্বারা পরিবেশ হইতে দেহে অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে ক্রমে দেহের ভিতরের দিকে অবস্থিত কোষে সঞ্চালিত হয়। উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড একই পদ্ধতিতে বিপরীত পথে দেহের বাহিরে চলিয়া যায়। স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বসবাসকারী চ্যাপ্টা কৃমিদের শ্বসনের কৌশলও এইরকম।

(খ) **ব্যাপন ও রক্তের সাহায্যে** (By diffusion and blood)—কেঁচো স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বাস করে। ইহার দেহের পরিধিতে কিউটিকল (Cuticle)-এর একটি পাতলা আবরণ আছে। এই আবরণ সবসময় ভিজা থাকে। বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ব্যাপন পদ্ধতিতে কেঁচোর ভিজা কিউটিকল এবং

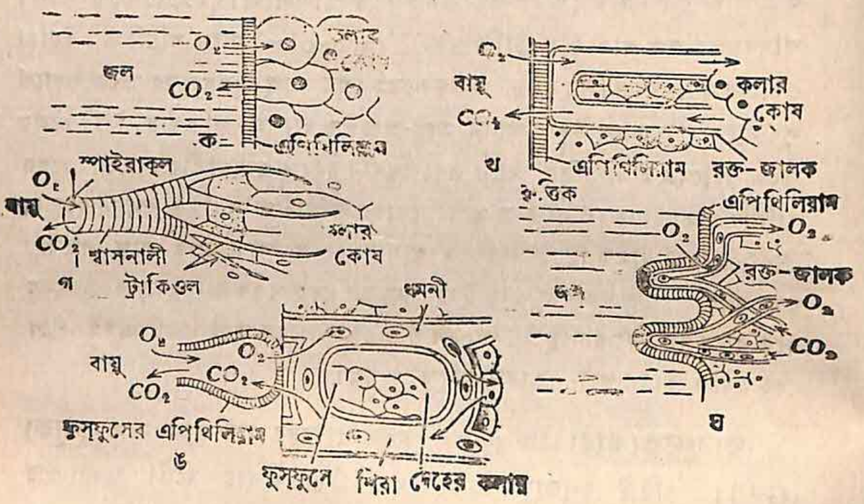
দেহ-প্রাকার ভেদ করিয়া দেহের পরিধিস্থ রক্তবাহর মধ্যে প্রবেশ করে এবং রক্ত-বাহিত হইয়া দেহের বিভিন্ন কোষে পৌছায় (5 নং চিত্র-খ, 6 নং চিত্র-খ)। ব্যাঙের চর্মের নিচে এবং মুখ-বিবরের আবরণের ভিতরের দিকে অনেক রক্তবাহ থাকে বলিয়া ব্যাঙ চর্ম এবং মুখ-বিবরের সাহায্যে এই উপায়ে শ্বসন করিতে পারে।

(গ) শ্বাসনালী দ্বারা (By tracheae)—আরসোলা, প্রজাপতি, মথ, মাছি, মশা এবং অন্যান্য সমস্ত পতঙ্গের দেহে (5 নং চিত্র-গ) অনেকগুলি সূক্ষ্ম এবং শাখা-যুক্ত নল থাকে। এই নলগুলিকে **শ্বাসনালী (Tracheae)** বলে। শ্বাসনালীর সূক্ষ্ম শাখাগুলি **ট্রাকিওল (Tracheoles)** নামে পরিচিত। ইহারা কোষের মধ্যে গিয়া শেষ হয়। ট্রাকিওলের শেষ প্রান্ত একধরনের তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে। কোষে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ট্রাকিওলের তরল পদার্থের মধ্যে চলিয়া আসে এবং সেখান হইতে শ্বাসনালীর মাধ্যমে দেহের বাহিরে চলিয়া যায় (6 নং চিত্র-গ)। দেহের পরিধিতে অবস্থিত **স্পাইরাক্ল (Spiracles)** নামক ছিদ্রের মাধ্যমে শ্বাসনালীগুলি পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। পতঙ্গের বক্ষ এবং উদর অঞ্চলের দেহ-খণ্ডকগুলির দ্রুত চলনের ফলে বায়ুমণ্ডল হইতে বায়ু স্পাইরাক্ল পথে দেহে প্রবেশ করে এবং একই পথে দেহ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যক্ত হয়।

(ঘ) ফুল্‌কা দ্বারা (By gills)—জলজ প্রাণীদের শ্বাস-যন্ত্রের নাম **ফুল্‌কা (Gill)**। প্রতিটি ফুল্‌কায় অনেকগুলি করিয়া সুতার মতো অথবা সূক্ষ্ম দণ্ডের মতো অংশ থাকে। এই অংশগুলির উপর কোষ-স্তরের পাতলা আবরণ থাকে। ফুল্‌কায় প্রচুর পরিমাণে রক্ত-জালক (Blood capillary) থাকে। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন কোষের পাতলা আবরণের মধ্য দিয়া রক্ত-জালকের রক্তে চলিয়া যায় এবং রক্ত হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হইয়া জলে মিশিয়া যায় (6 নং চিত্র-ঘ)। জলজ শামুক, ঝিনুক, মাছ (5 নং চিত্র-ঙ) ইত্যাদি প্রাণীতে ফুল্‌কার সাহায্যে শ্বসন হয়। মাছের ফুল্‌কাগুলি গলবিল (Pharynx)-এর দুই পাশে অবস্থিত দুইটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে থাকে। ইহাদের ক্ষেত্রে জল মুখের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া ফুল্‌কার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঐ প্রকোষ্ঠের বাহিরে চলিয়া আসে। ফুল্‌কার উপর দিয়া জলের প্রবাহ চলার সময় জল এবং ফুল্‌কার রক্তের মধ্যে গ্যাসের আদান-প্রদান হয়। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কম। কিন্তু জলজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের

ফলে উৎপন্ন অক্সিজেন জলজ প্রাণীদের অক্সিজেনের চাহিদা মিটাইতে সাহায্য করে।

(ঙ) **ফুস্‌ফুসের দ্বারা (By lungs)**—ব্যাঙ প্রভৃতি উভচর, টিকটিকি ও অন্যান্য সরীসৃপ, সমস্ত পক্ষী এবং মানুষ-সহ সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী বক্ষের মধ্যে অবস্থিত একজোড়া ফুস্‌ফুস(Lungs)-এর সাহায্যে শ্বসন করে (5 নং চিত্র-চ)। ফুস্‌ফুস থলির মতো। ইহাতে অসংখ্য আণুবীক্ষণিক প্রকোষ্ঠ থাকে। ইহাদের অ্যাল্‌ভিওলাই (Alveoli) বলে। প্রতিটি অ্যাল্‌ভিওলাস(Alveolus)-



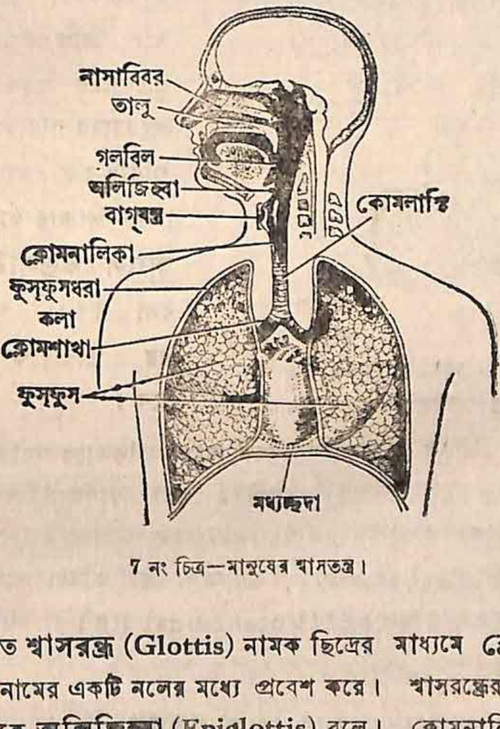
6 নং চিত্র—প্রাণীদের শ্বসনের কৌশল : ক. জটিলতা-বর্জিত জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে ; খ. কেঁচোয় ; গ. পতঙ্গে ; ঘ. মাছে ; ঙ. ফুস্‌ফুস-যুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীতে।

এর ভিতরের প্রাকারে কোষের পাতলা স্তর এবং বাহিরের দিকে রক্ত-জালক থাকে। বায়ু নাসারন্ধ্র-পথে মুখ-বিবরে প্রবেশ করে। সেখান হইতে ক্লোমনালিকা(Trachea)-র মাধ্যমে অবশেষে অ্যাল্‌ভিওলাসে পৌঁছায়। এখানেই অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড আদান-প্রদান হয়—অক্সিজেন বায়ু হইতে অ্যাল্‌ভিওলাসের রক্ত-জালকের রক্তে প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড রক্ত হইতে অ্যাল্‌ভিওলাসের মধ্যে চলিয়া আসে (6 নং চিত্র-ঙ)। কার্বন ডাই-অক্সাইড বিপরীত পথে বায়ুমণ্ডলে চলিয়া আসে। বলা বাহুল্য, ফুস্‌ফুসের দ্বারা কেবল বায়ু হইতেই অক্সিজেন নেওয়া যায়। কুমির, কচ্ছপ,

তিমি ইত্যাদি প্রাণী জলে বাস করিলেও বায়ু হইতে ফুসফুসের সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ করে।

মানুষের শ্বসন (Respiration in man)

আগে বলা হইয়াছে, একজোড়া ফুস্‌ফুসের সাহায্যে মানুষের শ্বসন সম্পন্ন হয়। **মুখ** (Mouth) এবং **নাসারন্ধ্র**(Nasal apertures)-এর মধ্য দিয়া বায়ুমণ্ডল হইতে গৃহীত বায়ু ফুস্‌ফুসে যাওয়ার পথে প্রথমে **গলবিল**(Pharynx)-এর

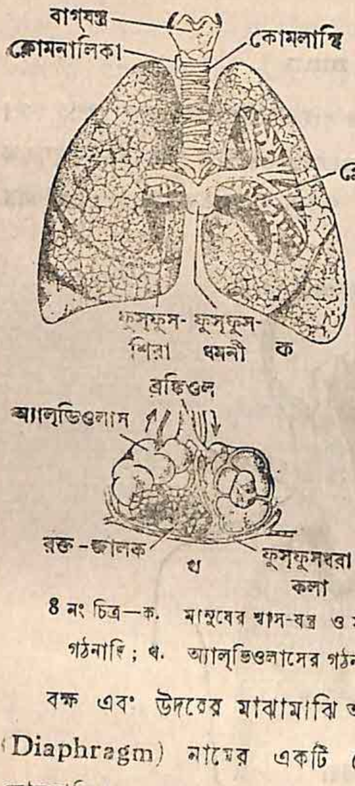


7 নং চিত্র—মানুষের শ্বাসতন্ত্র।

মেঝেয় অবস্থিত **শ্বাসরন্ধ্র** (Glottis) নামক ছিদ্রের মাধ্যমে **ক্লোমনালিকা** (Trachea) নামের একটি নলের মধ্যে প্রবেশ করে। শ্বাসরন্ধ্রের একটি ঢাকনা থাকে। ইহাকে **অলিজিহ্বা** (Epiglottis) বলে। ক্লোমনালিকা বক্ষদেশে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়। ক্লোমনালিকার প্রতিটি শাখাকে **ক্লোমশাখা** (Bronchus) বলে। দুইটি ক্লোমশাখার প্রান্তে দুইটি ফুস্‌ফুস অবস্থিত।

মানুষের ফুস্‌ফুস দুইটি বক্ষ-গহ্বর(Thoracic cavity)-এর দুই পাশে অবস্থিত। ইহারা স্পঞ্জের মতো নরম। ডানদিকের ফুস্‌ফুসটি বাঁদিকেরটির চেয়ে লম্বায় প্রায় আড়াই সেন্টিমিটার ছোট, কিন্তু অপেক্ষাকৃত চওড়া এবং আয়তনে বড়।

শ্লোমনালিকা এবং শ্লোমশাখার প্রাকারে কোমলাস্থি (Cartilage) থাকায়, উহাদের ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায় না। প্রতিটি শ্লোমশাখা ফুসফুসে প্রবেশ করার পর অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। শ্লোম-শাখার সর্বশেষ প্রশাখাগুলির প্রাকার খুব পাতলা। ইহাদের ব্রঙ্কিওল (Bronchioles) বলে। ব্রঙ্কিওলগুলি এক একটি প্রকোষ্ঠের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রকোষ্ঠের পরিধিতে অনিয়মিত পরিধি-যুক্ত অনেকগুলি ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ থাকে। ইহাদের **অ্যাল্‌ভিওলাই (Alveoli)** বলা হয়। অ্যাল্‌ভিওলাই-এর চারদিকে রক্ত-জালক থাকে।



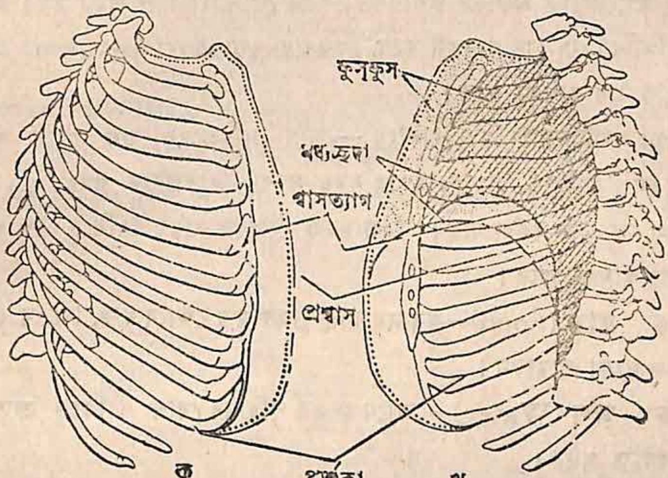
4 নং চিত্র—ক. মানুষের শ্বাস-যন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট গঠনাদি; খ. অ্যাল্‌ভিওলাসের গঠন।

বক্ষ এবং উদরের মাঝামাঝি অঞ্চলে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত **মধ্যচ্ছদা** (Diaphragm) নামের একটি পেশীময় পর্দা শ্বাসকর্মে সাহায্য করে। শ্লোমনালিকার শুরুতে একটি ছোট ত্রিকোণাকার প্রকোষ্ঠ থাকে। ইহাই **স্বরযন্ত্র** বা বাগ্‌যন্ত্র (Larynx)। ইহার মধ্যে দুইটি করিয়া সঙ্কোচী পাতলা পর্দা থাকে। ইহাদের **স্বরতন্ত্রী (Vocal cords)** বলে।

শ্বাসকর্ম (Breathing)

প্রশ্বাস (Inspiration) গ্রহণ এবং **শ্বাসত্যাগ (Expiration)** করাকে একসঙ্গে শ্বাসকর্ম (Breathing) বলে। প্রশ্বাস গ্রহণের সময়, পশুকা (Ribs)-সংলগ্ন পেশীর সঙ্কোচনে পশুকাগুলি সামনের দিকে এবং উপরের দিকে উঠিয়া যায়। একই সঙ্গে মধ্যচ্ছদা সঙ্কুচিত হইয়া নিচের দিকে নামিয়া যায় (9 নং চিত্র)। ইহাতে বক্ষ-গহ্বর ও ফুসফুসের আয়তন বাড়িয়া যায়। ফলে, ফুসফুসের ভিতরের বায়ুর চাপ কমিয়া যায় বলিয়া, বায়ুমণ্ডলের বায়ু নাসারন্ধ্র ও মুখ দিয়া প্রবেশ করিয়া শ্লোমনালিকার মাধ্যমে ফুসফুসে পৌছায়। শ্বাসত্যাগের সময়

পর্শুকা-সংলগ্ন পেশী এবং মধ্যচ্ছদা শিথিল (Relaxed) হইয়া যাওয়ায়, পর্শুকা-গুলি এবং মধ্যচ্ছদা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। ইহাতে বক্ষ-গহ্বরের আয়তন কমিয়া যাওয়ায়, ফুস্‌ফুসের উপরে চাপ পড়ে এবং অপেক্ষাকৃত বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড-যুক্ত বায়ু বিপরীত পথে দেহের বাহিরে চলিয়া যায়।



9 নং চিত্র—মানুষের শ্বাসকর্মের সময়ঃ ক. পর্শুকা এবং খ. ফুস্‌ফুস ও মধ্যচ্ছদার আপেক্ষিক অবস্থান।

বাগ্‌যন্ত্র শ্বাসকর্মে সরাসরি অংশগ্রহণ করে না। ফুসফুসের বহির্গামী বায়ু বাগ্‌যন্ত্রের স্বরতন্ত্রী কম্পিত করে। ফলে, স্বর (Voice) উৎপন্ন হয়। গলবিলের শেষভাগে খাদ্য প্রবেশের পথ এবং বায়ু প্রবেশের পথ শ্বাসরন্ধ্রের কাছাকাছি আসিয়া মিলিত হয়। খাদ্য গেলার সময় যাহাতে শ্বাসকর্ম স্বাভাবিক থাকে এবং শ্বাসরন্ধ্রের মধ্যে খাদ্যের কণা প্রবেশ করিয়া বিষম না লাগে, সেইজন্য ঐ সময় অলিজিহ্বা শ্বাসরন্ধ্রকে ঢাকিয়া রাখে 16 নং চিত্র।

শ্বসনের শর্ত (Conditions for respiration)

জীবের শ্বসন নিচে বর্ণিত শর্তগুলির উপর নির্ভরশীল—

(ক) অক্সিজেন (Oxygen)—বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ 5% হইলে, উদ্ভিদের শ্বসনের হার খুব কমিয়া যায়; কিন্তু অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। বায়ুর অক্সিজেনের পরিমাণ কম হইলে, বেশি পরিমাণ অক্সিজেন পাওয়ার জন্য, মানুষের শ্বাসকর্মের হার বাড়িয়া যায়।

(খ) কার্বন ডাই-অক্সাইড (Carbon dioxide)—বায়ুতে কার্বন

ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়া গেলে, উদ্ভিদের শ্বসনের হার কমিয়া যায়। মানুষের রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়া গেলে, উহা মস্তিষ্কের শ্বাসকেন্দ্রকে উত্তেজিত করে ; ফলে, শ্বাসকর্মের হার বাড়িয়া যায়।

(গ) **জীবনীশক্তি ও বয়স (Vitality and age)**—উদ্ভিদের মুকুল, মূলের শীর্ষ প্রভৃতি অঞ্চলের অপরিণত কোষে বেশি পরিমাণে শ্বসন হয়। মানব-শিশু মিনিটে 45 বার শ্বাসকর্ম করে, কিন্তু ছয় বছরের বালক-বালিকা মিনিটে মাত্র 25 বার শ্বাসকর্ম করে।

(ঘ) **সক্রিয়তা (Activity)**—বেশি পরিশ্রমের জন্য বেশি শক্তির প্রয়োজন। সেইজন্য, ব্যায়াম করার সময় অথবা দৌড়ানোর সময় শ্বাসকর্মের হার অনেক বেশি হইয়া যায়। বিশ্রামরত পূর্ণবয়স্ক মানুষ মিনিটে 15 হইতে 16 বার শ্বাসকর্ম করে।

(ঙ) **খাদ্য (Food)**—শ্বসনের হার বৃদ্ধির জন্য কোষে খাদ্য, বিশেষ করিয়া গ্লুকোজ থাকা প্রয়োজন।

(চ) **জল (Water)**—কোষে জলের পরিমাণ বেশি থাকিলে দ্রুতহারে শ্বসন হইতে পারে।

(ছ) **উষ্ণতা (Temperature)**—0° সেন্টিগ্রেড হইতে 45° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উষ্ণতার মধ্যে, উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের শ্বসনের প্রাথমিক হার বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ 30° সেন্টিগ্রেড উদ্ভিদের শ্বসনের পক্ষে সবচেয়ে ভালো। 30° সেন্টিগ্রেড হইতে 45° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে এই হার ক্রমশঃ কমিতে থাকে।

উপরে যে শ্বসনের কথা বলা হইল, তাহাতে বায়ুমণ্ডল হইতে, অথবা জলে দ্রবীভূত বায়ু হইতে অক্সিজেন নিয়া শ্বসন সম্পন্ন হয়। সেইজন্য, ইহাকে **সবাত শ্বসন (Aerobic respiration)** বলা হয়। কিন্তু অনেক সময় উদ্ভিদের সজীব কোষ এবং অন্ত্রে বসবাসকারী পরজীবী প্রাণীরা স্বভাবতঃ অক্সিজেন ছাড়াই, খাদ্যের স্বতঃ-জারণ(Auto-oxidation)-এর দ্বারা শ্বসন সম্পন্ন করে। ইহাকে **অবাত শ্বসন (Anaerobic respiration)** বলে। গ্লুকোজের অবাত শ্বসনে অপেক্ষাকৃত কম তাপ-শক্তি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড, এবং জলের পরিবর্তে ইথাইল অ্যাল্‌কোহল (Ethyl alcohol) উৎপন্ন হয়।

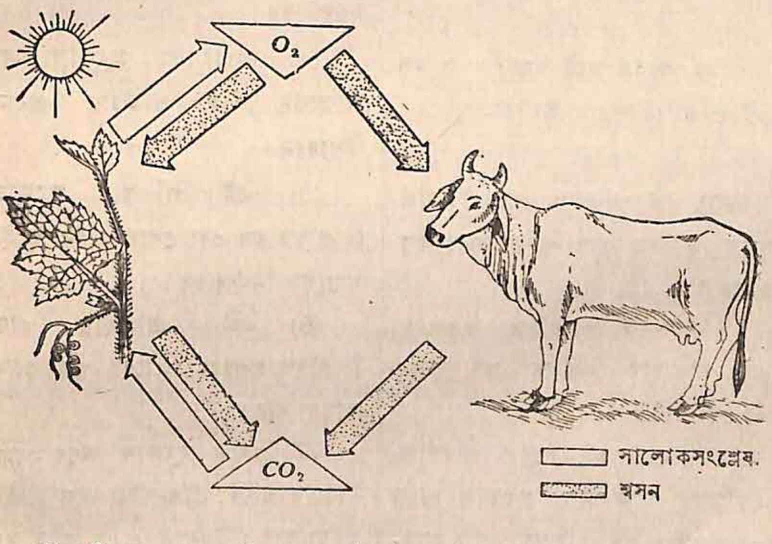
শ্বসনের তাৎপর্য (Significance of respiration)

জীবের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় শ্বসন অপরিহার্য। শ্বসনের ফলে উদ্ভূত শক্তির সাহায্যেই পুষ্টি (Nutrition), রেচন (Excretion), বৃদ্ধি (Growth),

চলন (Movement), গমন (Locomotion) ইত্যাদি যাবতীয় বিপাকীয় এবং শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ চলিতে পারে। শ্বসনে উদ্ভূত শক্তির অভাবে জীবনের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ স্তব্ধ হইয়া যায়।

সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের তুলনা (Comparison of photosynthesis and respiration)

বায়ুমণ্ডলে শতকরা 0·03 ভাগ কার্বন ডাই অক্সাইড এবং শতকরা 21 ভাগ অক্সিজেন আছে। সালোকসংশ্লেষের সময় উদ্ভিদ যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে, শ্বসনের সময় উদ্ভিদ ও প্রাণী



10 নং চিত্র—বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের সামঞ্জস্য রক্ষায় সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের ভূমিকা।

প্রায় সেই পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বাহির করিয়া দেয়। ফলে, এই দুইটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের সামঞ্জস্য অংশতঃ বজায় থাকে।

সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসন দুইটি বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া। উভয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বিক্রিয়া পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সালোকসংশ্লেষের আলোকবিহীন বিক্রিয়া শ্বসনের প্রাথমিক বিক্রিয়া (অর্থাৎ গ্লাইকোলিসিস-এর ঠিক বিপরীত)।

নিচে সালোকসংশ্লেষ এবং শ্বসনের তুলনামূলক আলোচনা দেওয়া হইল

সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis)	শ্বসন (Respiration)
(1) ইহা একরকম উপচিতি এবং বিজারণ প্রক্রিয়া।	(1) ইহা একরকম অপচিতি এবং জারণ প্রক্রিয়া।
(2) শুধুমাত্র উদ্ভিদের ক্লোরোফিল-যুক্ত কোষেই সালোকসংশ্লেষ হয়।	(2) জীবের সব সজীব কোষেই শ্বসন হয়।
(3) ইহা কেবল দিনের বেলায় আলোকের উপস্থিতিতেই হয়।	(3) এই প্রক্রিয়া আলোকের উপর নির্ভরশীল নয়, দিনরাত সব সময়ই হয়।
(4) কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল এই প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান।	(4) সাধারণতঃ গ্লুকোজ এবং অক্সিজেন এই প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান।
(5) এই প্রক্রিয়ার শেষে গ্লুকোজ সংশ্লেষিত হয় এবং অক্সিজেন বাহির হইয়া যায়।	(5) এই প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ বিশ্লেষিত হয় এবং শেষে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়।
(6) খাদ্য সংশ্লেষিত হওয়ায়, এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের শুষ্ক ওজন বাড়িয়া যায়।	(6) এই প্রক্রিয়ায় খাদ্য বিশ্লেষিত হওয়ায়, জীবের শুষ্ক ওজন কমিয়া যায়।
(7) সালোকসংশ্লেষে সৌরশক্তি স্থৈতিক শক্তি-রূপে গ্লুকোজ অণুর মধ্যে আবদ্ধ হয়। ফলে, প্রতি গ্রাম-অণু গ্লুকোজের মধ্যে 673 কিলোগ্রাম-ক্যালরি তাপ-শক্তি সঞ্চিত হয়।	(7) শ্বসনে গ্লুকোজ অণুর মধ্যস্থ স্থৈতিক শক্তি তাপ-শক্তি-রূপে বাহির হইয়া যায়। শ্বসনে প্রতি গ্রাম-অণু গ্লুকোজ হইতে 673 কিলোগ্রাম-ক্যালরি তাপ-শক্তি নির্গত হয়।

পুষ্টি, বিপাক ও পরিপাক
(Nutrition, Metabolism and Digestion)

২

প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে, জীবন-ধারণের জন্য খাদ্য ও (শ্বসনে প্রয়োজনীয়) অক্সিজেন অপরিহার্য। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে বাঁচিয়া থাকার জন্য কেবল খাদ্য ও অক্সিজেন-ই যথেষ্ট নয়। ইহার জন্য, জল, কয়েক রকম খনিজ পদার্থ (Minerals) এবং নানাধরনের ভাইটামিন(Vitamins)-ও প্রয়োজন। নিচের কয়েকটি অনুচ্ছেদে খাদ্য, জল, খনিজ পদার্থ এবং ভাইটামিনের প্রকারভেদ, উপযোগিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা করা হইল।

খাদ্য (Food)

যাহা গ্রহণ করিলে জীব-দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি হয় এবং যাহা হইতে জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াশীলতার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পাওয়া যায়, তাহাকে **খাদ্য** (Food) বলে। খাদ্য প্রধানতঃ তিন রকমের। যেমন—(1) কার্বো-হাইড্রেট (Carbohydrates), (2) স্নেহদ্রব্য ও তৈল (Fats and oils) এবং (3) প্রোটীন (Proteins)। নিচে ইহাদের বিষয়ে বলা হইল।

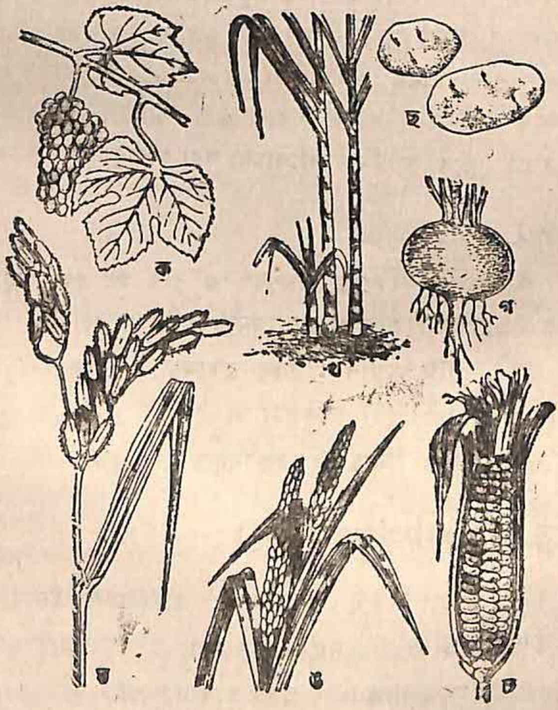
কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates)

ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি, বিস্কুট, গোল-আলু, রাঙা-আলু ইত্যাদি খাদ্যে **শ্বেতসার** বা **স্টার্চ** (Starch) নামের একধরনের কার্বোহাইড্রেট প্রচুর পরিমাণে থাকে। প্রত্যহ ব্যবহৃত চিনি প্রকৃতপক্ষে ইক্ষু-শর্করা (Cane sugar) বা সুক্রোজ (Sucrose)। ইহাও আর একধরনের কার্বোহাইড্রেট। ইহারা সকলেই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়া গঠিত, এবং ইহাদের অণুতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত জলের অণুর মতো, অর্থাৎ 2 : 1। সেইজন্য, ইহাদের এইরকম নামকরণ হইয়াছে। কার্বোহাইড্রেটের রাসায়নিক সঙ্কেত নিচে দেওয়া হইল।

$C_x(H_2O)_y \cdots x$ এবং y-এর মান বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেটের ক্ষেত্রে বিভিন্ন।

দ্রাক্ষা-শর্করা (Grape sugar বা গ্লুকোজ (Glucose), ইক্ষু শর্করা ইত্যাদিকে **শর্করা** (Sugars) বলা হয়। গ্লুকোজ, ফল-শর্করা বা ফ্রাক্টোজ

(Fructose) ইত্যাদি শর্করার অণুতে 6টি করিয়া কার্বন পরমাণু থাকে। ইহাদের রাসায়নিক সঙ্কেত—$C_6H_{12}O_6 \cdots x$ এবং y-এর মান 6। ইহাদের মনোস্যাকারাইড(Monosaccharides)-ও বলা হয়। মনোস্যাকারাইড সরল শর্করা। আবার, সুক্রোজ, দুগ্ধ-শর্করা বা ল্যাক্‌টোজ (Lactose), সীরা-শর্করা বা ম্যাল্‌টোজ (Maltose) ইত্যাদি শর্করার অণুতে 12টি করিয়া কার্বন পরমাণু থাকে (রাসায়নিক সঙ্কেত—$C_{12}H_{22}O_{11}$)। ইহাদের ডাইস্যাকারাইড (Disaccharides) বলে। দুই অণু মনোস্যাকারাইড দিয়া



11 নং চিত্র—কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের নানা উৎস : ক. আঙুর (দ্রাক্ষা-শর্করা), খ. আখ ও গ. বীট (ইক্ষু-শর্করা), ঘ. ধান, ঙ. গম, চ. ভুট্টা এবং ছ. গোল-আলু (শ্বেতসার)।

এক অণু ডাইস্যাকারাই গঠিত হয়। যেমন—এক অণু গ্লুকোজ এবং এক অণু ফ্রাক্‌টোজ দিয়া এক অণু সুক্রোজ তৈয়ারি হয়। সেইজন্য, ইহাদের ডাইস্যাকারাইড বলা হয়।

পাকা আঙুর, কুল, আপেল ইত্যাদি ফলে এবং পিঁয়াজে প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ, এবং আখের কাণ্ডে ও বীটের মূলে বেশি পরিমাণে সুক্রোজ থাকে। নানাধরনের পাকা মিষ্ট ফলে ফ্রাক্‌টোজ এবং দুধে ল্যাক্‌টোজ থাকে।

আগের পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্করাগুলি ছাড়া অন্য সব কার্বোহাইড্রেটের অণু অনেকগুলি করিয়া মনোস্যাকারাইডের একক দিয়া গঠিত। সেইজন্য, ইহাদের **পলিস্যাকারাইড (Polysaccharides)** বলা হয়। শ্বেতসার অন্যতম পলিস্যাকারাইড। বিভিন্ন খাদ্যশস্যে এবং গোল-আলুতে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার সঞ্চিত খাদ্য হিসাবে থাকে। যেমন—চাউলে 70% হইতে ৮0%, গমে প্রায় 70%, ভুট্টায় প্রায় 88% এবং গোল-আলুতে 20%।

ছত্রাক নামক অসবুজ উদ্ভিদের কোষে এবং প্রাণীদের যকৃতে ও পেশীতে **গ্লাইকোজেন (Glycogen)** নামে আর এক ধরনের পলিস্যাকারাইড সঞ্চিত থাকে। গ্লাইকোজেন অনেক বিষয়ে শ্বেতসারের মতো এবং প্রধানতঃ প্রাণীদের দেহে পাওয়া যায়। সেইজন্য, ইহাকে প্রাণী-শ্বেতসার(Animal starch)-ও বলা হয়।

সেলুলোজ Cellulose)-ও একধরনের জটিল পলিস্যাকারাইড। ইহা দিয়া উদ্ভিদের কোষ-প্রাকার তৈয়ারি হয়। শাকাশী প্রাণীদের খাদ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে। কিন্তু গরু, মহিষ প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণী এবং উই ছাড়া অন্য প্রাণী সেলুলোজ হজম করিতে পারে না।

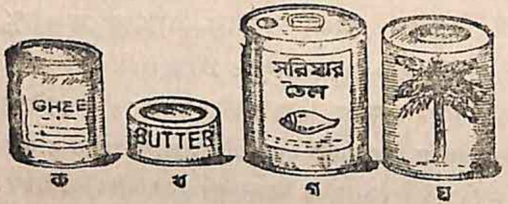
অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন খাদ্য-সঞ্চয়কারী অঙ্গে প্রধানতঃ শ্বেতসার হিসাবে জমা থাকে। পরে প্রয়োজন হইলে, শ্বেতসার উৎসেচকের প্রভাবে গ্লুকোজে পরিণত হয়। প্রাণীদের দেহে কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্য কেবল গ্লাইকোজেন হিসাবেই সঞ্চিত থাকে—যকৃতে বেশি পরিমাণে এবং পেশীতে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে। প্রয়োজনের সময় গ্লাইকোজেন গ্লুকোজে পরিণত হয়। গ্লুকোজের জারণ(শ্বসন)-এর ফলে (তাপ) শক্তি উৎপন্ন হয়—ইহা প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। কাজেই, কার্বোহাইড্রেট শক্তিপ্রদ খাদ্য। নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্যের জারণে যত একক তাপ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐ খাদ্যের তাপন-মূল্য (Calorific value) বলে। তাপন-মূল্যের সাহায্যে বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করা হয়। 100 গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের জারণের ফলে প্রায় 409 কিলোগ্রাম-ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয়।

স্নেহদ্রব্য ও তৈল (Fats and oils)

ঘি, মাখন, চর্বি, বনস্পতি ঘি এবং সরিষা, নারিকেল, বাদাম প্রভৃতি তৈল প্রধানতঃ স্নেহদ্রব্য ও তৈল দিয়া গঠিত। কার্বোহাইড্রেটের মতো, স্নেহদ্রব্য ও তৈল-ও কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়া গঠিত ; তবে ইহাদের

ক্ষেত্রে অক্সিজেনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। এই-জাতীয় খাদ্য স্বাভাবিক উষ্ণতায় কঠিন অথবা অর্ধ-তরল থাকিলে, তাহাকে সাধারণতঃ স্নেহদ্রব্য (Fats), এবং তরল হইলে তৈল (Oi s) বলা হয়।

উদ্ভিদের প্রায় সব কোষের সাইটোপ্লাজ্‌মে তৈল খুব সূক্ষ্ম বিন্দুর মতো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। উদ্ভিদের খাদ্য-সঞ্চয়কারী অঙ্গ, বিশেষ করিয়া তৈল-প্রধান বীজ, ভ্রূণ এবং ভাজক কলায় প্রচুর পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়। রেড়ি ও নারিকেলের সস্যে ; সরিষা, সূর্যমুখী, বাদাম, তিল ইত্যাদির বীজপত্রে বেশি পরিমাণে তৈল জমা থাকে।



12 নং চিত্র—স্নেহদ্রব্য ও তৈল-জাতীয় খাদ্য : ক. ঘি ; খ. মাখন ; গ. সরিষার তৈল ; ঘ. বনস্পতি ঘি।

মানুষের বৃক্ক(Kiddney)-এর চারপাশে এবং চর্মের নিচে, বিশেষ করিয়া পেটের চর্মের নিচে, প্রচুর পরিমাণে চর্বি সঞ্চিত থাকে। ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীর ধারণঝিল্লী(Mesentery)-তেও অনেক চর্বি থাকে। তিমির চর্মের নিচে যে চর্বির স্তর থাকে, তাহা খুবই পুরু হয়।

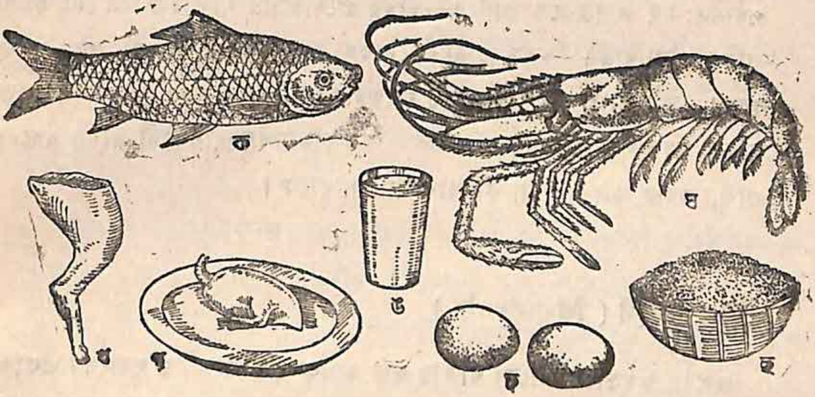
100 গ্রাম স্নেহদ্রব্যের জারণের ফলে প্রায় 928 কিলোগ্রাম-ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয়। সুতরাং, কার্বোহাইড্রেটের তুলনায় ইহার তাপন-মূল্য অনেক বেশি। সেই কারণে, ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য প্রাণীরা কার্বোহাইড্রেটের চেয়ে স্নেহদ্রব্য বেশি পরিমাণে জমা করিয়া রাখে।

অতএব দেখা যাইতেছে, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহদ্রব্য ও তৈল—এই দুই ধরনের খাদ্যের প্রধান কাজ শক্তি সরবরাহ করা। সুতরাং, ইহারা শক্তিপ্রদ খাদ্য (Energy producing-foods)।

প্রোটীন (Proteins)

মাছ, মাংস, চিংড়ি, ডিম, দুধ এবং বিভিন্ন রকমের ডা'লে প্রচুর পরিমাণে প্রোটীন থাকে। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কখনও কখনও সাল্‌ফার ও ফস্‌ফরাস দিয়া প্রোটীন গঠিত। অনেকগুলি সরল শর্করার একক যেমন শ্বেতসার গঠন করে, তেমনি অসংখ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড (Amino acid) নামের জৈব যৌগ দিয়া প্রোটীন তৈয়ারি হয়।

শ্বেতসার-প্রধান বীজে সঞ্চিত প্রোটীনের পরিমাণ কম। যেমন, চাউলে মাত্র 7% এবং গমে 12% প্রোটীন থাকে। তৈল-প্রধান বীজে, অবশ্য, বেশি প্রোটীন পাওয়া যায়; যেমন, সূর্যমুখীর বীজে 30% প্রোটীন থাকে। বিভিন্ন ডা'লে গড়ে প্রায় 25% এবং সয়াবীনে 42% হইতে 47% প্রোটীন সঞ্চিত থাকে। প্রাণীরা নিজেদের দেহে ভবিষ্যতের জন্য প্রোটীন সঞ্চয় করিয়া রাখে না।



13নং চিত্র—প্রোটীন খাদ্যের উৎস: ক. মাছ; খ. পাঁঠার মাংস; গ. মুরগির মাংস; ঘ. চিংড়ি; ঙ. দুধ; চ. ডিম; ছ. ডা'ল।

প্রোটীনের তাপন-মূল্য প্রায় কার্বোহাইড্রেটের মতো। কাজেই, শক্তি-উৎপন্নকারী খাদ্য হিসাবে ইহার উপযোগিতা স্নেহদ্রব্য ও তৈলের তুলনায় কম। কিন্তু অন্য গুণের জন্য প্রোটীন খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য।

প্রোটীনের প্রধান কাজ দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করা। অতএব, প্রোটীনকে দেহগঠনকারী খাদ্য (Body-building food) বলা যায়। প্রোটীন প্রোটোপ্লাজ্‌মের প্রধান উপাদান। কাজেই, জীবের দেহগঠনের জন্য প্রোটীন অপরিহার্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, মোট তেইশটি বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড জীবের প্রয়োজনে লাগে। মানুষ নিজের দেহে অ্যামাইনো অ্যাসিড মাত্র তেরোটি সংশ্লেষিত করিতে পারে। বাকি দশটির জন্য (প্রোটীন) খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়।

জল (Water)

প্রোটোপ্লাজ্‌মের শতকরা 60 হইতে 90 ভাগ জল দিয়া গঠিত। জলের মাধ্যমে অধিকাংশ বিপাকীয় পরিবর্তন ঘটে। অনেক জৈব যৌগ কোষের জলে

দ্রবীভূত থাকে। কাজেই, ইহা জীব-দেহের অন্যতম দ্রাবক (Solvent)। জলে দ্রাব্য অধিকাংশ জৈব যৌগ প্রয়োজনমতো এক কোষ হইতে অন্য একটি কোষে জলের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। কোষের আস্রবণ চাপ (Osmotic pressure) জলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। ইহা জীব-দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে ঠাণ্ডা রাখিতে সাহায্য করে। বাষ্পমোচনের ফলে উদ্ভিদের দেহের, এবং প্রধানতঃ ঘর্ম ও মূত্ররূপে প্রাণীদের দেহের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। স্থলজ উদ্ভিদরা দেহের প্রায় সমগ্র তল দিয়া জল শোষণ করে। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণী খাদ্যের সঙ্গে যে জল গ্রহণ করে, তাহা ছাড়া আবার শুধু জলও পান করিয়া থাকে। মরুভূমিতে বসবাসকারী কয়েক ধরনের প্রাণী, অবশ্য, জল পান না করিয়াও বাঁচিয়া থাকে।

খনিজ পদার্থ (Minerals)

জীবের সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকার জন্য কয়েক ধরনের খনিজ পদার্থের একান্ত প্রয়োজন। এই খনিজ পদার্থগুলি প্রধানতঃ খনিজ লবণ (Mineral salts) হিসাবে গৃহীত হয়। উদ্ভিদরা মূলের সাহায্যে, এবং প্রাণীরা খাদ্য ও জলের সঙ্গে খনিজ পদার্থ গ্রহণ করে। নিচে জীবের প্রয়োজনীয় কয়েকটি খনিজ পদার্থের উপযোগিতা ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হইল।

সোডিয়াম (Sodium)—ইহা প্রাণীদের রক্তের এবং দেহের অন্যান্য তরল পদার্থের গঠনগত ধর্ম বজায় রাখে এবং অম্লতা প্রশমিত করে। ইহা কোষের আভেদ্যতা রক্ষা করে।

পটাশিয়াম (Potassium)—ইহা প্রোটোপ্লাজ্‌মের আভেদ্যতা রক্ষা করে এবং উৎসেচককে সক্রিয় করে। উদ্ভিদের কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটীন সংশ্লেষে ইহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রাণীদের নার্ভ(Nerve)-এর স্বাভাবিক কাজের জন্য ইহা প্রয়োজন।

তাম্র বা কপার (Copper)—ইহা উদ্ভিদের ক্লোরোফিল গঠনে সাহায্য করে। চিংড়ি ইত্যাদি প্রাণীদের রক্তে হিমোসায়ানিন (Haemocyanin) নামের যে শ্বাস-কণা (Respiratory pigment) থাকে, ইহা তাহার অন্যতম উপাদান।

ম্যাগ্‌নেশিয়াম (Magnesium)—কতকগুলি উৎসেচক ম্যাগ্‌নেশিয়াম

দিয়া গঠিত। ইহা ক্লোরোফিল গঠন করিতে সাহায্য করে। প্রাণীদের নার্ভের স্বাভাবিক কাজের জন্য এবং অস্থি গঠনে ইহা প্রয়োজন।

ক্যাল্‌শিয়াম (Calcium)—ইহা উদ্ভিদের কোষ-প্রাকার গঠনে সাহায্য করে এবং মূলের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে ইহা প্রয়োজনীয়। ইহা প্রাণীদের অস্থির অন্যতম প্রধান উপাদান। রক্তের অম্লতা প্রশমিত করাও ইহার কাজ।

ফস্‌ফরাস (Phosphorus)—কয়েকটি উৎসেচক ফস্‌ফরাস দিয়া গঠিত। নিউক্লিয়াসের প্রোটীনে ফস্‌ফরাস থাকে। ইহা কোষ-বিভাজনে সাহায্য করে। ফস্‌ফরাস প্রাণীদের অস্থির অন্যতম উপাদান এবং ইহা রক্তের অম্লতা প্রশমিত করে।

গন্ধক বা সাল্‌ফার (Sulphur)—ইহা কয়েক ধরনের প্রোটীন গঠনে প্রয়োজন হয়। শ্বসনে প্রয়োজনীয় কতকগুলি শ্বাস-উৎসেচকও সাল্‌ফার দিয়া গঠিত। ইহা প্রাণীদের দেহে ইন্‌সুলিন (Insulin) নামক হর্‌মোন গঠন করিতে সাহায্য করে।

লৌহ বা আয়রন (Iron)—শ্বসনে অংশ-গ্রহণকারী সাইটোক্রোম (Cytochrome) নামক উৎসেচক আয়রন দিয়া গঠিত। আয়রন ক্লোরোফিল গঠনে সাহায্য করে। প্রাণীদের রক্তের হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) নামক শ্বাস-কণা আয়রন দিয়া গঠিত।

ক্লোরিন (Chlorine)—ইহা প্রাণীদের রক্ত ও দেহের অন্যান্য তরল পদার্থের সঠিক গঠন বজায় রাখে।

ফ্লোরিন (Fluorine)—ইহা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দন্তের এনামেল (Enamel) গঠন করে।

আয়োডিন (Iodine)—ইহা প্রাণীদের থাইরক্সিন (Thyroxine) নামক হর্‌মোনের উপাদান।

ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)—ইহা উৎসেচকের সঙ্গে থাকিয়া প্রোটীন বিপাকে অংশ গ্রহণ করে এবং কয়েক ধরনের প্রাণীর স্বাভাবিক জননের জন্য অপরিহার্য।

কোবল্ট্‌ (Cobalt)—ইহা উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। ইহা ছাড়া, কোবল্ট্‌ ভাইটামিন B_{12}-এর উপাদান।

দস্তা বা **জিঙ্ক্** (Zinc)—ইহা ক্লোরোফিল গঠনে সাহায্য করে। জিঙ্ক্ একধরনের উদ্ভিজ্জ হর্‌মোনের অন্যতম উপাদান।

ভাইটামিন (Vitamins)

জীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য আর এক শ্রেণীর জৈব যৌগের প্রয়োজন হয়। ইহাদের ভাইটামিন বলে। অবশ্য, খুব অল্প পরিমাণে ইহাদের দরকার হয়। প্রায় 200 বিভিন্ন ধরনের ভাইটামিনের কথা জানা যায়। অধিকাংশ ভাইটামিন উদ্ভিদের দেহেই সংশ্লেষিত হয়। ভাইটামিন A এবং ভাইটামিন D এই দুইটি ভাইটামিন প্রাণিদেহে তৈরি হয়। উদ্ভিদ-দেহে সবগুলি ভাইটামিনের কাজ সঠিক জানা যায় নাই ; তবে, প্রাণীদের স্বাভাবিক জীবন-ধারণের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের ভাইটামিন একান্ত প্রয়োজন। কতকগুলি ভাইটামিন জলে (নিচের তালিকায় * চিহ্নিত), আবার অন্য কতকগুলি স্নেহদ্রব্যে দ্রাব্য (নিচের তালিকায় ♱ চিহ্নিত)। নিচে প্রধান প্রধান ভাইটামিন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

♱ **ভাইটামিন A (Vitamin A)** বা **অ্যাক্সেরফ্‌থল (Axerophthol)**—ইহার অভাবে প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, রোগ-সংক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং 'রাতকাণা' (Night blindness) রোগ হয়। গাজর এবং অধিকাংশ সবুজ সব্‌জিতে প্রাপ্য ক্যারোটিন (Carotine) নামক রঞ্জক কণা হইতে প্রাণিদেহে এই ভাইটামিন সংশ্লেষিত হয়। ভাইটামিন A পাইতে হইলে মাছের যকৃৎ হইতে উৎপন্ন তৈল, দুধ, মাখন, ডিম, সবুজ সব্‌জি এবং গাজর খাদ্যরূপে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

* **ভাইটামিন B কম্‌প্লেক্স্ (Vitamin B Complex)**—ভাইটামিন B কম্‌প্লেক্স্ বলিতে অনেকগুলি বিভিন্ন নামধারী ভাইটামিনকে দলগতভাবে বোঝায়। নিচে ভাইটামিন B কম্‌প্লেক্সের অন্তর্গত প্রধান কতকগুলি ভাইটামিনের কথা বলা হইল।

(ক) **ভাইটামিন B_1 (Vitamin B_1)** বা **থিয়ামিন (Thiamine)**—উদ্ভিদের মূলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এই ভাইটামিন প্রয়োজন হয়। ইহার অভাবে বেরি বেরি (Beri beri), ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি রোগ হয়। ঢেঁকি-ছাঁটা

চাউল, লাল আটা, ঈস্ট (Yeast), ডিমের কুসুম, যকৃৎ ইত্যাদিতে প্রচুর থিয়ামিন থাকে।

(খ) **ভাইটামিন B_2 (Vitamine B_2)** বা **রাইবোফ্লাভিন (Riboflavin)**—ইহার অভাবে মুখের দুই পাশ ফাটিয়া যায় এবং ফুলিয়া উঠে। সবুজ শাক-সব্জি, দুধ, ডিম যকৃত এবং ঈস্ট এই ভাইটামিনের উৎস।

(গ) **ভাইটামিন B_6 (Vitamin B_6)** বা **পাইরিডক্সিন (Pyridoxine)**—ইহা উদ্ভিদের মূলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। ইহার অভাবে কুকুর এবং শুয়ারের রক্তাল্পতা, ইঁদুরের ত্বকের প্রদাহ এবং মুরগি, ইঁদুর ও শুয়ারের পক্ষাঘাত রোগ হয়। চাউল, গম, ভুট্টা, দুধ এবং যকৃৎ—এই ভাইটামিনের প্রধান উৎস।

(ঘ) **ভাইটামিন B_{12} (Vitamin B_{12})** বা **কোবালামিন (Cobalamine)**—ইহার অভাবে দুরারোগ্য রক্তাল্পতা হয়, সুষুম্নাকাণ্ড নষ্ট হইয়া যাইতে থাকে এবং শিশু-প্রাণীদের বৃদ্ধির হার কমিয়া যায়। এই ভাইটামিন পাইতে হইলে মাছ, মাংস, যকৃৎ, দুধ, ডিমের কুসুম ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

* **ভাইটামিন C (Vitamin C)** বা **অ্যাস্‌কর্‌বিক অ্যাসিড (Ascorbic acid)**—এই ভাইটামিনের অভাবে স্কার্ভি (Scurvy) রোগ হয়। লেবু-জাতীয় ফল, টম্যাটো, শাক-সব্জি ভাইটামিন C-এর উৎস। মানুষ, বানর-জাতীয় প্রাণী এবং গিনিপিগ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীরা এই ভাইটামিন নিজেদের দেহে তৈয়ারি করিতে পারে।

† **ভাইটামিন D (Vitamin D)** বা **কোল্‌ক্যাল্‌সিফেরল (Cholecalciferol)**—ইহার অভাবে শিশুদের রিকেট (Ricket) রোগ হয়; অর্থাৎ, অস্থি সবল হয় না এবং বিকৃত হইয়া যায়। মাছের যকৃৎ হইতে প্রাপ্ত তৈল, দুধ, মাখন, ডিম ইত্যাদি খাদ্যরূপে গ্রহণ করিলে এই ভাইটামিনের অভাব হয় না। ইহা ছাড়া, সূর্যালোকের প্রভাবে মানুষের চর্মে এই ভাইটামিন কিছু পরিমাণে সংশ্লেষিত হয়।

† **ভাইটামিন E (Vitamin E)** বা **টোকোফেরল (Tocopherol)**—ইহার অভাবে ইঁদুর, কুকুর, খরগোস এবং মোরগের স্বাভাবিক জনন-

ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। ডিম, লেটুস ও অন্যান্য শাক-সব্জি, নানাধরনের উদ্ভিজ্জ স্নেহদ্রব্য ও তৈলে এই ভাইটামিন পাওয়া যায়।

*ভাইটামিন K (Vitamin K)—ইহার অভাবে রক্তের তঞ্চন (Coagulation) হইতে পারে না। সাধারণভাবে শাক-সব্জি হইতে এই ভাইটামিন পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী জীবাণু (Bacteria) এই ভাইটামিন সংশ্লেষিত করে।

খনিজ পদার্থ এবং ভাইটামিন হইতে শক্তি পাওয়া যায় না। ইহারা রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে এবং সুস্থতা বজায় রাখিতে সাহায্য করে। সেইজন্য, ইহাদের রক্ষী খাদ্য (Protective foods) বলা যায়।

পুষ্টি (Nutrition)

আগের অনুচ্ছেদগুলিতে বলা হইয়াছে যে, জীবের স্বাভাবিক জীবন-ধারণ ও বৃদ্ধির জন্য খাদ্য, জল, কয়েক ধরনের খনিজ পদার্থ ও ভাইটামিন এবং অক্সিজেন প্রয়োজন। যে পদ্ধতিতে জীব আপন পরিবেশ হইতে স্বাভাবিক জীবন-ধারণ ও (অক্সিজেন ছাড়া) বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি গ্রহণ করে, তাহাকে **পুষ্টি** বা **নিউট্রিশন** (Nutrition) বলা যায়।

ক্লোরোফিল থাকায় সবুজ উদ্ভিদরা নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেরাই প্রস্তুত করিতে পারে। সেইজন্য, ইহাদের **স্বভোজ জীব** (**Autotropic organisms**) বলা হয়। ছত্রাক ও অন্যান্য অসবুজ উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের দেহে ক্লোরোফিল না থাকায়, ইহারা খাদ্যের জন্য পর নির্ভর। ইহাদের **পরভোজী জীব** (**Heterotropic organisms**) বলে। স্বভোজী জীব অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদরা যে পদ্ধতিতে পুষ্টি সাধন করে, তাহার নাম **হলোফাইটিক পুষ্টি** (**Holophytic nutrition**)। প্রাণীরা যে পদ্ধতিতে পুষ্টি সাধন করে, তাহাকে **হলোজোয়িক পুষ্টি** (**Holozoic nutrition**) বলে। এই দুইটি প্রধান পদ্ধতি ছাড়া, অন্যান্য পরভোজী জীব কয়েকটি বিশিষ্ট পদ্ধতিতে পুষ্টি সাধন করে। নিচে এবিষয়ে আলোচনা করা হইল।

হলোফাইটিক পুষ্টি (Holophytic nutrition)

এই পুষ্টি-পদ্ধতিতে উদ্ভিদ মূলরোমের সাহায্যে মাটি হইতে নানা অজৈব খনিজ লবণের দ্রবণ শোষণ করিয়া এবং পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল হইতে

কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করিয়া ক্রমান্বয়ে প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্য প্রস্তুত করে। এই খাদ্য অপেক্ষাকৃত সরল বলিয়া, সংশ্লেষের পর সরাসরি প্রোটোপ্লাজ্‌ম গঠন করে, অথবা অক্সিজেনের দ্বারা জারিত হইয়া শক্তি নির্গত করে। এই পুষ্টি দুই পর্যায়ে বিভক্ত—**সংশ্লেষ** (Synthesis) এবং **আত্তীকরণ** (Assimilation)। দেহে খাদ্য তৈয়ারি হওয়াকে সংশ্লেষ, এবং সংশ্লেষিত খাদ্য প্রোটোপ্লাজ্‌মের অঙ্গীভূত হওয়াকে আত্তীকরণ বলা হয়।

হলোফাইটিক পুষ্টি সাধারণতঃ সালোকসংশ্লেষকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত। সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন গ্লুকোজ একই সঙ্গে দুই ধরনের বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

একদিকে, অন্যান্য শর্করা এবং শ্বেতসার ও সেলুলোজ প্রভৃতি জটিল কার্বোহাইড্রেট তৈয়ারি করে। এই সমস্ত কার্বোহাইড্রেট সরাসরি কোষের বৃদ্ধি ঘটায় (যেমন, সেলুলোজ কোষ-প্রাকার গঠন করে); অথবা, খাদ্য-সঞ্চয়কারী অঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য হিসাবে সঞ্চিত থাকে।

অন্যদিকে, শ্বসনের সময় গ্লুকোজ হইতে বিভিন্ন ধরনের জৈব অ্যাসিড তৈয়ারি হয়। একধরনের জৈব অ্যাসিড হইতে ফ্যাটি অ্যাসিড (Fatty acid) তৈয়ারি হয়। এই ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারল (Glycerol) নামক যৌগের সঙ্গে যুক্ত হইয়া স্নেহদ্রব্য ও তৈল প্রস্তুত করে। স্নেহদ্রব্য ও তৈল সরাসরি প্রোটোপ্লাজ্‌মের অঙ্গীভূত হয়, অথবা শ্বেতসারের মতো, খাদ্য-সঞ্চয়কারী অঙ্গে (অর্থাৎ বীজ, কাণ্ড, মূল ইত্যাদিতে) উদ্বৃত্ত খাদ্য হিসাবে সঞ্চিত থাকে। প্রয়োজনের সময়, ইহা আবার বিশ্লেষিত হইয়া ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল উৎপন্ন করে।

উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে মাটি হইতে নাইট্রেট(Nitrate)-জাতীয় লবণ গ্রহণ করে। এই নাইট্রেট মূল হইতে সংবহন কলার মধ্য দিয়া বর্ধমান অঞ্চলে নীত হয়। সেখানে উৎসেচকের সাহায্যে ইহা অ্যামোনিয়া(Ammonia)-তে বিজারিত হয়। শ্বসনের ফলে উৎপন্ন জৈব অ্যাসিড অ্যামোনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন রকম অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈয়ারি করে। অ্যামাইনো অ্যাসিড হইতে এক জটিল বিক্রিয়ার মধ্য দিয়া প্রোটীন সংশ্লেষিত হয়। প্রোটীন সরাসরি প্রোটোপ্লাজ্‌ম গঠন করে। ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য হিসাবে উদ্বৃত্ত প্রোটীন সঞ্চিত থাকে।

হলোজোয়িক পুষ্টি (Holozoic nutrition)

এই পুষ্টি-পদ্ধতিতে প্রাণীরা উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণী, অথবা উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ জটিল খাদ্য গ্রহণ করে। সেইজন্য, খাদ্যগ্রহণের ঠিক পরেই খাদ্য সরাসরি প্রোটোপ্লাজ্‌মের অঙ্গীভূত হইতে পারে না। ইহার জন্য খাদ্য অপেক্ষাকৃত সরল এবং শোষণযোগ্য (অর্থাৎ পরিপাক) হওয়া প্রয়োজন। এই হিসাবে, হলোজোয়িক পুষ্টি-পদ্ধতির পাঁচটি পর্যায় দেখা যায়। যেমন—(ক) খাদ্যগ্রহণ (Feeding), (খ) পরিপাক (Digestion), (গ) শোষণ (Absorption), (ঘ) আত্তীকরণ (Assimilation) এবং (ঙ) অপাচ্য অংশের বহিষ্করণ (Egestion)। পরের অনুচ্ছেদগুলিতে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

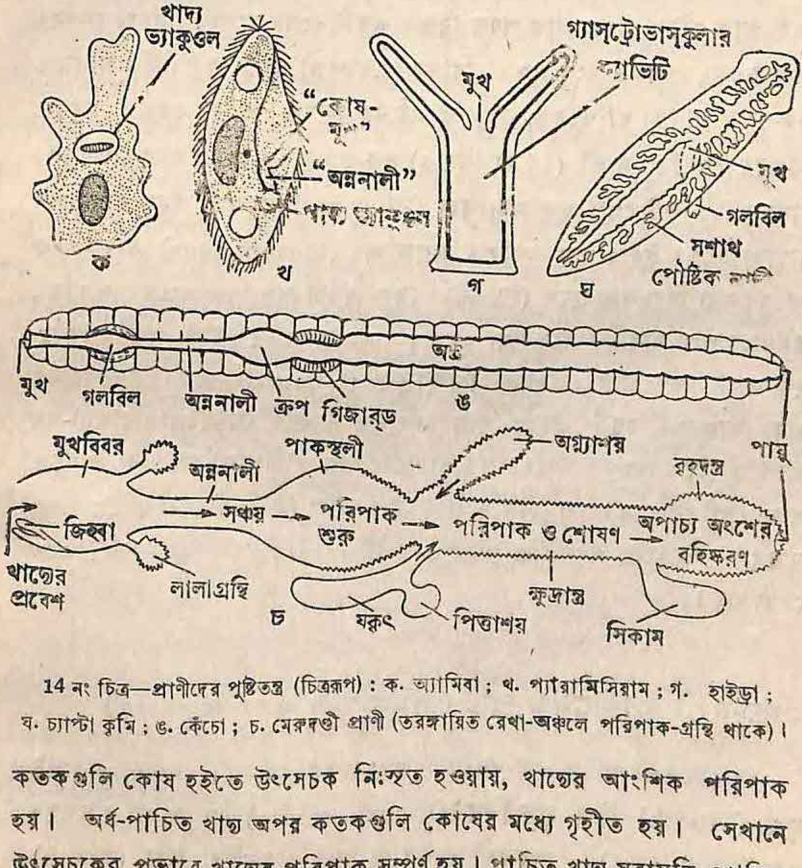
অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের পুষ্টি (Nutrition in invertebrates)

এককোষী প্রাণী অ্যামিবা(*Amoeba*)-র পুষ্টি-পদ্ধতি জটিলতা-বর্জিত। ইহা দেহের যে-কোনও অঞ্চল হইতে **ক্ষণপাদ** বা **স্যুডোপোডিয়া** (Pseudopodia) বিস্তার করিয়া খাদ্যকে চারদিক হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলে। ক্রমে ঐ খাদ্য তরলপূর্ণ **খাদ্য-ভ্যাকুওল**(**Food** vacuole)-এর অন্তর্ভুক্ত হয় (14 নং চিত্র-ক)। প্যারামিসিয়াম (*Paramecium*) নামক সিলিয়া-যুক্ত অন্য একটি এককোষী প্রাণীতে দেহের নির্দিষ্ট স্থানে **ওরাল গ্রুভ** (Oral groove) নামক একটি খাঁজ থাকে। ওরাল গ্রুভের শেষপ্রান্তে অবস্থিত 'কোষ মুখ' (Cell mouth) নামক নির্দিষ্ট ছিদ্রপথে **'অন্ননালী'** (Oesophagus) নামক আণুবীক্ষণিক নালীর মাধ্যমে খাদ্য অবশেষে খাদ্য-ভ্যাকুওলে পৌছায় (14 নং চিত্র-খ)। সাইটোপ্লাজ্‌ম খাদ্য-ভ্যাকুওলের মধ্যে উৎসেচক নিঃসরণ করে। ইহাতে খাদ্য পরিপাক হয়, পাচিত খাদ্য সরাসরি সাইটোপ্লাজ্‌মে শোষিত হয়। খাদ্যের অপাচ্য অংশ দেহের যে-কোনও স্থান ভেদ করিয়া বাহিরে চলিয়া যায়।

স্পঞ্জ্ (Sponges) নামক অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহের পরিধিতে অসংখ্য ছিদ্র এবং দেহের মধ্যে অনেকগুলি শাখা-প্রশাখা-যুক্ত নালী থাকে। জলস্রোতের সঙ্গে সূক্ষ্ম খাদ্য-কণা ঐ ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়া দেহের ভিতরে অবস্থিত নালীতে পৌছায়। এই নালীগুলির নির্দিষ্ট অঞ্চলে ফ্লাজেলা(Flagella)-যুক্ত

একধরনের বিশিষ্ট রকম কোষ থাকে। খাদ্য-কণাগুলি এই কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং এককোষী প্রাণীদের মতো, সেখানেই খাদ্য পরিপাক হয় এবং পাচিত খাদ্য সরাসরি শোষিত হয়। খাদ্যের অপাচ্য অংশ জলস্রোতের সঙ্গে দেহের বাহিরে চলিয়া যায়।

একনালীদেহী প্রাণী (Coelenterata) হাইড্রা (*Hydra*) উহার মুখের চারদিকে অবস্থিত **কর্ষিকা**(Tentacles)-র সাহায্যে ছোট ছোট জীবন্ত খাদ্য ধরিয়া মুখের মাধ্যমে দেহের মধ্যস্থ **গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার ক্যাভিটি (Gastrovascular cavity)** নামের একটিমাত্র নালীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয় (14 নং চিত্র-গ)। গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার ক্যাভিটির পরিধিতে অবস্থিত



14 নং চিত্র—প্রাণীদের পুষ্টিতন্ত্র (চিত্ররূপ) : ক. অ্যামিবা ; খ. প্যারামিসিয়াম ; গ. হাইড্রা ; ঘ. চ্যাপ্টা কৃমি ; ঙ. কেঁচো ; চ. মেরুদণ্ডী প্রাণী (তরঙ্গায়িত রেখা-অঞ্চলে পরিপাক-গ্রন্থি থাকে)।

কতকগুলি কোষ হইতে উৎসেচক নিঃসৃত হওয়ায়, খাদ্যের আংশিক পরিপাক হয়। অর্ধ-পাচিত খাদ্য অপর কতকগুলি কোষের মধ্যে গৃহীত হয়। সেখানে উৎসেচকের প্রভাবে খাদ্যের পরিপাক সম্পূর্ণ হয়। পাচিত খাদ্য সরাসরি শোষিত হয়। খাদ্যের অপাচ্য অংশ মুখের মাধ্যমে দেহের বাহিরে চলিয়া যায়।

অধিকাংশ চ্যাপ্টা কৃমি(Flat worms)-র মুখ এবং সশাখ পৌষ্টিক নালী (Alimentary canal) আছে (14 নং চিত্র-ঘ)। ইহাদের পায়ু (Anus) নাই। মুখ দিয়া পৌষ্টিক নালীতে খাদ্য প্রবেশ করিলে, পৌষ্টিক নালীর ভিতরের প্রাকারে অবস্থিত কতকগুলি কোষ হইতে উৎসেচক নিঃসৃত হয়। এই উৎসেচক পৌষ্টিক নালীর গহ্বরে অবস্থিত খাদ্য পরিপাক করে। পাচিত খাদ্য পৌষ্টিক নালীর প্রাকারে শোষিত হয় এবং খাদ্যের অপাচ্য অংশ মুখ দিয়া দেহের বাহিরে চলিয়া যায়।

উচ্চতর অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের পৌষ্টিক নালীকে সম্পূর্ণ (Complete) বলা হয়। কারণ, ইহাদের মুখ ও পায়ু দুইই থাকে। ইহাদের পৌষ্টিক নালী দেহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নলের মতো। ইহার কোনও অংশ চওড়া, কোনও অংশ সরু। বিভিন্ন অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের পৌষ্টিক নালীতে কম-বেশি পার্থক্য থাকিলেও, উহাদের গঠনের মূলগত ভিত্তি একই। যেমন, কেঁচোর পৌষ্টিক নালী (14 নং চিত্র ঙ) শুরু হয় মুখে—ইহার কাজ খাদ্যগ্রহণ। মুখের পরে একটি পেশীবহুল **গলবিল** (Pharynx) থাকে। ইহা খাদ্যগ্রহণে সাহায্য করে। ইহার পরে অবস্থিত **অন্ননালী** (Oesophagus) নামক সরু অংশের মধ্য দিয়া খাদ্য **ক্রপ** (Crop) নামক একটি প্রসারিত অংশে পৌঁছায়; এইখানে খাদ্য সাময়িকভাবে জমা থাকে। ক্রপের পরে পেশীময় পুরু প্রাকার-যুক্ত একটি অংশ থাকে; ইহাকে **গিজার্ড** (Gizzard) বলে। গিজার্ডের মধ্যে খাদ্য চূর্ণ হয়। ইহার পরে অবস্থিত বিস্তীর্ণ **অন্ত্র**(Intestine)-এর প্রাকার হইতে নিঃসৃত উৎসেচকের সাহায্যে খাদ্য পরিপাক হয় এবং পাচিত খাদ্য শোষিত হয়। খাদ্যের অপাচ্য অংশ **পায়ু** (Anus) দিয়া বাহির হইয়া যায়। আরসোলা ও অন্যান্য পতঙ্গের পৌষ্টিক নালীতেও এই সমস্ত অংশ দেখা যায়।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পুষ্টি (Nutrition in vertebrates)

সব মেরুদণ্ডী প্রাণীর পুষ্টি-পদ্ধতি মূলতঃ একই ধরনের। ইহারা সকলেই **মুখ** (Mouth) দিয়া **মুখ বিবর**(Mouth cavity)-এর মধ্যে খাদ্যগ্রহণ করে (14 নং চিত্র-চ)। মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোয়ালে সাধারণতঃ **দন্ত** (Teeth) এবং মুখ-বিবরের মেঝেয় একটি পেশীময় **জিহ্বা** (Tongue) থাকে। দন্ত ও

জিহ্বা খাদ্যকে মুখ-বিবরের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে সাহায্য করে। খাদ্যকে মুখ-বিবরের মধ্যে টুকরা করা দন্তের অন্ত কাজ। প্রায় সব মেরুদণ্ডী প্রাণীর কয়েক জোড়া করিয়া **লালাগ্রন্থি** (Salivary glands) আছে। লালাগ্রন্থি হইতে **লালা** (Saliva) নিঃসৃত হইয়া মুখ-বিবরের মধ্যে খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়া যায়। ইহার পর খাদ্য **গলবিল** (Pharynx)নামক ক্ষুদ্র অংশের মধ্য দিয়া **অন্ননালী** (Oesophagus) নামক এক সরু নালীর মাধ্যমে **পাকস্থলী** Stomach)-তে পৌছায়। পাকস্থলী থলির মতো অংশ। পৌষ্টিক নালীর এই অংশে খাদ্য সাময়িকভাবে জমা থাকে এবং খাদ্যের আংশিক পরিপাকও এখানে হয়। পাকস্থলী হইতে খাদ্য **ক্ষুদ্রান্ত্র**(Small intestine)-এ পৌছায়। ক্ষুদ্রান্ত্র খুব লম্বা এবং প্যাচানো। এইখানেই খাদ্যের পরিপাক সম্পূর্ণ হয় এবং পা চত খাদ্য শোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের পরবর্তী অংশ **বৃহদন্ত্র** (Large intestine)। এখানে খাদ্যের শোষণ সম্পূর্ণ হইয়া এবং খাদ্যের অপাচ্য অংশ হইতে জল-শোষণের ফলে **মল** (Faeces) প্রস্তুত হয়। মল **অবসারণী** (Cloaca) নামক পরবর্তী প্রশস্ত অংশে পৌছিলে, নিয়মিত সময় অন্তর অন্তর **অবসারণী-ছিদ্র** (Cloacal aperture)-এর মাধ্যমে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। অবসারণী এবং অবসারণী-ছিদ্রের মাধ্যমে মূত্র এবং জনন-কোষও দেহ হইতে বাহিরে যায়। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীর মল, অবশ্য, **পায়ু**(Anus)-র মাধ্যমে দেহের বাহির হইয়া যায়—মূত্র ও জনন-কোষ বাহির হওয়ার জন্য পৃথক ছিদ্র থাকে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে দুইটি বড় **পরিপাক-গ্রন্থি** (Digestive glands) থাকে—ইহারা যথাক্রমে **যকৃৎ** (Liver) এবং **অগ্ন্যাশয়** (Pancreas)। এই পরিপাক-গ্রন্থি দুইটির নালী ক্ষুদ্রান্ত্রের গহ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়।

সব মেরুদণ্ডী প্রাণীর পরিপাকের পদ্ধতি মূলতঃ একইরকম এবং মানুষের পরিপাক-পদ্ধতির মতো (পরে দ্রষ্টব্য)।

পরিপাকে বিভিন্ন উৎসেচক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। সেইজন্য, পরিপাক সম্বন্ধে বুঝিতে হইলে উৎসেচকদের বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন। নিচের অনুচ্ছেদে উৎসেচক সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা হইল।

উৎসেচক (Enzymes)

বিপাকের প্রায় সমস্ত বিক্রিয়া যে বিশেষ শ্রেণীর জৈব যৌগের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাকে **উৎসেচক** বা **এন্‌জাইম** (Enzyme) বলে। উৎসেচক

প্রধানতঃ দুই রকম কাজ করে। ইহা প্রথমতঃ, প্রোটোপ্লাজ্মের মধ্যে কখন কোন বিক্রিয়া ঘটা দরকার, তাহা নির্দিষ্ট করে, এবং দ্বিতীয়তঃ, বিক্রিয়াগুলি যে হারে ঘটিবে তাহা নিয়ন্ত্রণ করে। উৎসেচককে একরকম জৈব অনুঘটক (Biological catalyst) বলা যায়। অজৈব অনুঘটকগুলি কোনও বিক্রিয়ায় যেমন খুব অল্প পরিমাণে লাগে, উৎসেচকও তেমনি কোষের মধ্যে খুব কম পরিমাণে থাকিয়া বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করিতে পারে। বিক্রিয়ার পরে উৎসেচকের আঙ্গিক (Qualitative) এবং মাত্রিক (Quantitative) পরিবর্তন হয় না।

বিভিন্ন বিক্রিয়ার জন্য প্রোটোপ্লাজ্মে বিভিন্ন রকম উৎসেচক থাকে, এবং কোনও নির্দিষ্ট উৎসেচক শুধু একটি নির্দিষ্ট বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। ফলে, প্রতিটি উৎসেচকের কাজ সীমিত। কোষে এককালীন প্রায় এক লক্ষ বিভিন্ন উৎসেচক থাকে, এবং একই সময়ে এক হইতে দুই হাজার বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়।

সমস্ত উৎসেচক প্রধানতঃ দুই রকম বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে :—

(ক) কোনও জটিল জৈব যৌগকে বিশ্লেষিত করিয়া অপেক্ষাকৃত সরল যৌগে পরিণত করে ; এইধরনের বিক্রিয়াগুলিকে **বিশ্লেষণ বিক্রিয়া (Degradation reactions)** বলে। যেমন—

$$\text{শ্বেতসার} + \text{জল} \underset{\substack{\text{অ্যামাইলেজ} \\ \text{(উৎসেচক)}}}{\rightleftharpoons} \text{গ্লুকোজ}$$

(খ) সরল যৌগ হইতে অপেক্ষাকৃত জটিল যৌগ তৈয়ারি করে ; ইহাদের **সংশ্লেষ বিক্রিয়া (Synthetic reactions)** বলা হয়। যেমন—

$$\text{গ্লুকোজ} + \text{ফ্রাক্টোজ} \underset{\substack{\text{সুক্রেজ} \\ \text{(উৎসেচক)}}}{\rightleftharpoons} \text{সুক্রোজ} + \text{জল}$$

উৎসেচক যে জৈব যৌগকে বিশ্লেষিত অথবা সংশ্লেষিত করে, তাহাকে **সাব্স্ট্রেট (Substrate)** বলা হয়। সাধারণতঃ, সাব্স্ট্রেটের নাম অনুসারে, অথবা যে ধরনের বিক্রিয়া ঘটায়, সেই অনুসারে, উৎসেচকের নামকরণ করা হয়। উৎসেচকের নামের শেষে তিনটি অক্ষর '—ase'। যেমন—অ্যামাইলেজ (Amylase), সুক্রেজ (Sucrase) ইত্যাদি। অবশ্য, পেপ্সিন (Pepsin),

ট্রিপ্‌সিন (Trypsin) ইত্যাদি উৎসেচকের নামকরণ ইহার ব্যতিক্রম। নিচে কয়েক শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য উৎসেচকের নাম, ক্রিয়াশীলতা ইত্যাদি দেওয়া হইল।

(ক) **হাইড্রোলেজ** (Hydrolases)—ইহারা সাধারণতঃ সাব্‌স্ট্রেটকে আর্দ্র-বিশ্লেষ (Hydrolysis) করে। অ্যামাইলেজ, পেপ্‌সিন, ট্রিপ্‌সিন ইত্যাদি অধিকাংশ পরিপাক-উৎসেচক (Digestive enzymes) এই শ্রেণীভুক্ত।

(খ) **লা'য়েজ** (Lyases)—এই শ্রেণীর উৎসেচকগুলি সাব্‌স্ট্রেটকে সরাসরি বিশ্লিষ্ট করে। উদাহরণ—কার্বক্সিলেজ (Carboxylase)।

(গ) **ট্রান্‌স্‌ফারেজ** (Transferases)—ইহারা সাব্‌স্ট্রেটকে বিশ্লিষ্ট করিয়া উহার কোনও অংশকে অন্য যৌগের সঙ্গে জুড়িয়া দেয়। ট্রান্‌স্‌-অ্যামাইনেজ (Transaminase), ফস্‌ফোকাইনেজ (phosphokinase) প্রভৃতি এইধরনের উৎসেচক।

(ঘ) **অক্সিডো-রিডাক্‌টেজ** (Oxido-reductases)—এই শ্রেণীর উৎসেচক সাব্‌স্ট্রেটকে জারিত অথবা বিজারিত করে। যেমন—ডিহাইড্রোজেনেজ (Dehydrogenase), গ্লুকোজ-অক্সিডেজ (Glucose-oxidase) ইত্যাদি।

সমস্ত উৎসেচক দুইটি অংশ নিয়া গঠিত। প্রধান অংশটি প্রোটীন দিয়া তৈয়ারী—ইহাকে **অ্যাপো-এন্‌জাইম** (Apo-enzyme) বলা হয়। অপর অংশটিকে **প্রস্‌থেটিক গ্রুপ** (Prosthetic group) বলে। শেষের অংশটি প্রোটীন দিয়া গঠিত হইতে পারে, অথবা প্রোটীন ছাড়া অন্য কোনও জৈব যৌগ হইতে পারে। প্রোটীন ছাড়া অন্য জৈব যৌগ দিয়া গঠিত প্রস্‌থেটিক গ্রুপের **কো-এন্‌জাইম** (Co-enzyme) বলে। অ্যাডেনোসিন ট্রাইফস্‌ফেট (Adenosine triphosphate) বা এ. টি. পি. (ATP) জীব-দেহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কো-এন্‌জাইম।

উৎসেচক-নিয়ন্ত্রিত বিক্রিয়া উষ্ণতা এবং প্রোটোপ্লাজ্‌মের অম্লতার ওপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ 20° হইতে 40° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উৎসেচক সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে। ইহার কম-বেশি উষ্ণতায় বিক্রিয়ার হার কমিয়া যায়।

মানুষের পুষ্টি (Nutrition in man)

অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মতো মানুষের পুষ্টিও খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, শোষণ, আত্তীকরণ এবং অপাচ্য অংশের বহিষ্করণ—এই কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত। পর পৃষ্ঠায় ইহাদের বর্ণনা দেওয়া হইল।

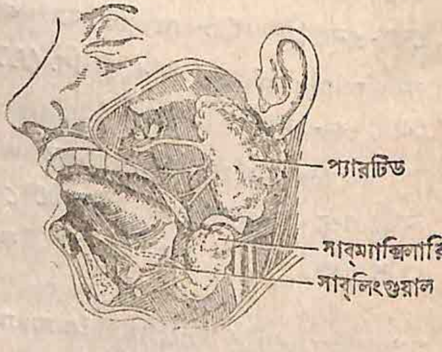
খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক (Feeding and digestion)

যে প্রক্রিয়ায় প্রাণী মুখ-বিবরে খাদ্য প্রবেশ করাইয়া দেয়, তাহাকে **খাদ্য-গ্রহণ** (Feeding) বলে। দুইটি ওষ্ঠ, জিহ্বা এবং দন্তের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানুষ খাদ্যগ্রহণ করে। মানুষের **ওষ্ঠ** (Lips) দুইটি নমনীয়। খুব সুবেদী বলিয়া ইহাদের সাহায্যে খাদ্যের ভৌত ধর্ম ও উষ্ণতা বুঝিতে পারা যায়। মানুষের **জিহ্বা** (Tongue) পেশীময়, খুব সহজে নানাদিকে নড়াচড়া করিতে এবং আকৃতি পরিবর্তন করিতে পারে। **দন্ত** (Teeth) খাদ্য কাটা-ছেঁড়া এবং পেষণ করে।

যে প্রক্রিয়ায় জটিল খাদ্য উৎসেচকের সাহায্যে ভাঙিয়া সরল ও শোষণযোগ্য অবস্থায় পৌছায়, তাহাকে **পরিপাক** (Degestion) বলে। 38 ও 39 পৃষ্ঠায় নানাধরনের উৎসেচকের কথা বলা হইয়াছে। পরিপাকে কেবল আর্দ্র-বিশ্লেষক (Hydrolyzing) উৎসেচকগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়—জলের অণু খাদ্যের জটিল অণুর সঙ্গে যুক্ত হইয়া পাচক-উৎসেচকের সাহায্যে, দুইটি কিংবা তাহার বেশি সরল ও শোষণযোগ্য অণুতে পরিণত হয়। অর্থাৎ—

$$\text{খাদ্যের জটিল অণু} + \text{জলের অণু} \xrightarrow{\text{পাচক উৎসেচক}} \text{সরল ও শোষণযোগ্য অণু}$$

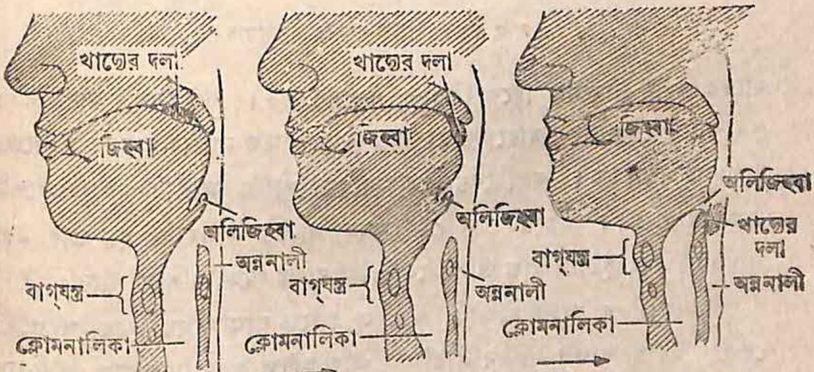
চর্বণের ফলে খাদ্য সূক্ষ্ম কণায় বিভক্ত হয়। এই সময়ে খাদ্য তিন জোড়া **লালাগ্রন্থি** (Salivary glands) হইতে নিঃসৃত **লালা**(Saliva)-র সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এই তিন জোড়া লালাগ্রন্থির নাম **সাব্‌ম্যাক্সিলারি** (Submaxillary), **সাব্‌লিংগুয়াল** (Sublingual) এবং **প্যারটিড** (Parotid) **লালাগ্রন্থি**। ইহারা যথাক্রমে নিচের চোয়ালে ও জিহ্বার নিচে পাশাপাশি এবং দুইটি কানের নিচের দিকে থাকে। ইহাদের নালী মুখ-বিবরে যুক্ত হয়। প্রধানতঃ খাদ্য গ্রহণের সময়েই লালা নিঃসৃত হয়; তবে, খাদ্যের দর্শন এবং আঘ্রাণেও লালা নিঃসৃত হয়।



15 নং চিত্র—মানুষের লালাগ্রন্থি।

লালা সান্দ্র (Viscous) তরল-বিশেষ। ইহাতে **টায়ালিন** (Ptyalin) নামের উৎসেচক, **মিউসিন** (Mucin) নামক প্রোটীন এবং জল থাকে। টায়ালিনের প্রভাবেমুখ-বিবরেই মানুষের খাদ্য-পরিপাক শুরু হইয়া যায়। টায়ালিন শ্বেতসার-বিশ্লিষ্টকারী উৎসেচক। ইহা মুখ-বিবরের ক্ষারীয় মাধ্যমে শ্বেতসারকে ম্যাল্‌টোজ নামক ডাইস্যাকারাইডে পরিবর্তিত করে।

খাদ্য ভালভাবে চর্বিত এবং লালার সঙ্গে মিশ্রিত হইলে, **গলাধঃকরণ** (Swallowing) করা হয়। এই সময়ে জিহ্বা, চর্বিত খাদ্যকে মুখ-বিবরের শেষভাগে অবস্থিত গলবিল নামক অপ্রশস্ত অংশে ঠেলিয়া দেয়। এইভাবে খাদ্যের একটি দলা তৈয়ারী হয়। ইহার পর তালুর নমনীয় মুক্ত-প্রান্ত (Soft palate) উপরে উঠিয়া গিয়া নাসা-বিবর(Nasal cavity)-এর ছিদ্রকে বন্ধ করিয়া দেয়, এবং স্বরযন্ত্র (কণ্ঠমণি) উপরের দিকে উঠিয়া গিয়া অলিজিহ্বার গায়ে চাপ দেয়। ফলে, অলিজিহ্বা শ্বাসরন্ধ্রের ছিদ্র বন্ধ করিয়া দেয় এবং অন্ননালীর ছিদ্র বড় হইয়া যায়। তখন খাদ্যের দলা অন্ননালীতে প্রবেশ করে (16 নং চিত্র)। হড়্‌হড়ে মিউসিন-মিশ্রিত থাকায়, খাদ্যের গলাধঃকরণ সহজসাধ্য হয়। কোনও

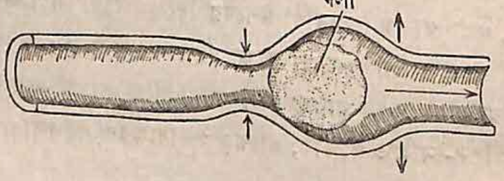


16 নং চিত্র—মানুষের খাদ্য গলাধঃকরণ-পদ্ধতি।

কারণে, খাদ্যগ্রহণের সময় তালুর নমনীয় মুক্ত-প্রান্ত, স্বরযন্ত্র এবং অলিজিহ্বার স্বাভাবিক চলনে ব্যাঘাত হইলে, খাদ্যের কণা ভুল পথে চালিত হইয়া ক্লোম-নালিকায় প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে খুব জোরে কাশি হয়, ইহাকে বিষম লাগা বলে। কাশির ফলে খাদ্যের কণা ছিট্‌কাইয়া মুখ-গহ্বরে ফিরিয়া আসে।

খাদ্যের দলা একবার অন্ননালীতে প্রবেশ করিলে, পৌষ্টিক নালীর **ক্রম-সঙ্কোচ** (Paristalsis) নামক বিশেষ পেশীয় প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবে পৌষ্টিক

নালীর পরবর্তী অংশের দিকে চালিত হয়। পৌষ্টিক নালীর প্রাকারে অনৈচ্ছিক পেশীগুলি (Involuntary muscles) দুইভাবে বিন্যস্ত থাকে—কতকগুলি অনুদৈর্ঘ্যভাবে (Longitudinally) অর্থাৎ পৌষ্টিক নালীর দৈর্ঘ্য-বরাবর এবং অন্যগুলি অনুপ্রস্থভাবে অর্থাৎ বৃত্তাকারে থাকে। অনুদৈর্ঘ্য পেশীর সঙ্কোচনে পৌষ্টিক নালীর দৈর্ঘ্য কমিয়া যায়, কিন্তু উহার গহ্বরের আয়তন বাড়িয়া যায়। অনুপ্রস্থ পেশীর সঙ্কোচনে তেমনি পৌষ্টিক নালী দৈর্ঘ্যে বাড়ে, কিন্তু উহার গহ্বরের আয়তন কমিয়া যায়। খাদ্যের দলার ঠিক সামনে অনুদৈর্ঘ্য পেশীগুলি, এবং খাদ্যের দলার ঠিক পিছনে বৃত্তাকার পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয়। ইহাতে



17 নং চিত্র—পৌষ্টিক নালীর ক্রমসঙ্কোচ।

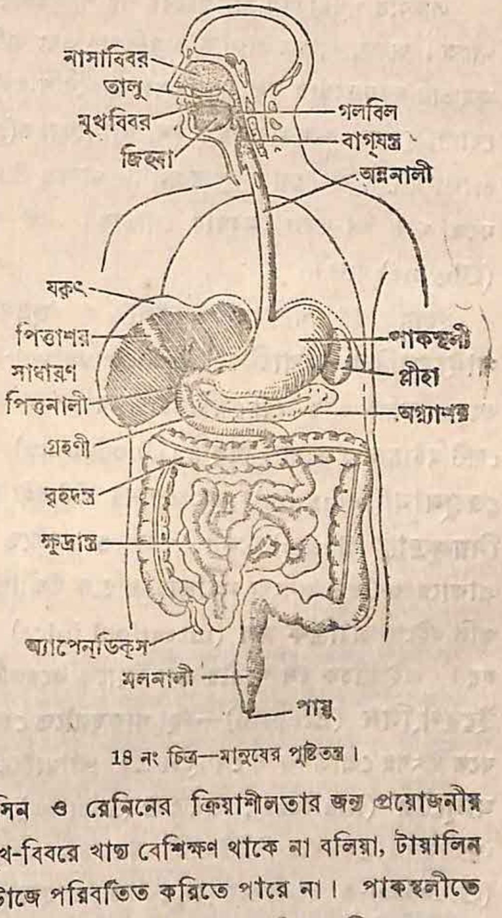
খাদ্যের দলা সামনের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়। এইভাবে, অনুদৈর্ঘ্য ও বৃত্তাকার পেশীগুলির ক্রমান্বয়ে সঙ্কোচনের ফলে পৌষ্টিক নালীর মধ্য দিয়া খাদ্যের অগ্রগতি সম্ভব হয়। গলবিলের পরে অবস্থিত পৌষ্টিক নালীর সমগ্র অংশেই ক্রমসঙ্কোচ হয়। ইহার ফলে যে কেবল খাদ্যের অগ্রগতিই হয় তাহা নয়, পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য ভালভাবে পাচক রসের সঙ্গে মিশিতে পারে।

অন্ননালী লম্বা নলের মতো। গলবিল হইতে পাকস্থলীতে খাদ্য পাঠাইয়া দেওয়া ইহার কাজ। অন্ননালীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে খাদ্য পৌঁছিতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগে। ইহা কোনও পাচক রস নিঃসরণ করে না। সেইজন্য, অন্ননালীতে খাদ্যের পরিপাক হয় না।

পাকস্থলী (Stomach)

পাকস্থলী প্রায় 28 সেন্টিমিটার লম্বা একটি থলির মতো। সাময়িকভাবে খাদ্য জমা করিয়া রাখা, খাদ্যকে পাচক-রসের সঙ্গে ভালভাবে মিশ্রিত করা এবং খাদ্যের পরিপাক করা ইহার কাজ। পাকস্থলীর প্রাকারে 35,000,000-এরও বেশি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম **পাক-গ্রন্থি** (Gastric glands) থাকে। ইহারা দৈনিক

গড়ে 2,000 হইতে 3,000 ঘন-সেন্টিমিটার পাক-রস (Gastric juice) নিঃসরণ করে। খাদ্যের আস্বাদন এবং আঘ্রাণে পাক-রস নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হয় এবং খাদ্য পাকস্থলীতে পৌঁছলে, গ্যাস্ট্রিন (Gastrin) নামক হর্মোনের প্রভাবে আরও বেশি করিয়া পাক-রস নিঃসৃত হয়। পাক-রসে মিউসিন, প্রায় 0·2% হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Hydrochloric Acid) এবং পেপ্‌সিন (Pepsin) ও রেনিন (Rennin) নামের দুইটি প্রধান উৎসেচক থাকে। মিউসিন খাদ্যকে আরও হড়হড়ে করে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খাদ্যের সঙ্গে আগত জীবাণু



18 নং চিত্র—মানুষের পুষ্টিতন্ত্র।

মারিয়া ফেলে এবং পেপ্‌সিন ও রেনিনের ক্রিয়াশীলতার জন্য প্রয়োজনীয় আম্লিক মাধ্যম সৃষ্টি করে। মুখ-বিবরে খাদ্য বেশিক্ষণ থাকে না বলিয়া, টায়ালিন শ্বেতসারকে সম্পূর্ণভাবে ম্যল্‌টোজে পরিবর্তিত করিতে পারে না। পাকস্থলীতে পৌঁছানোর পরও টায়ালিন-মিশ্রিত খাদ্যে ঐ উৎসেচকের ক্রিয়া চলিতে থাকে। টায়ালিন আম্লিক মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। সেইজন্য, পাকস্থলীতে পৌঁছানোর পর ধীরে ধীরে এই বিক্রিয়া বন্ধ হয়। পেপ্‌সিন ও রেনিন এই দুইটি উৎসেচকই প্রোটীন-বিশ্লিষ্টকারী (Protein splitting)। পেপ্‌সিন কয়েক ধরনের প্রোটীনকে আংশিকভাবে বিশ্লিষ্ট করিয়া প্রোটিওজ (Proteoses) এবং পেপ্‌টোন (Peptones) নামক পলিপেপ্‌টাইড (Polypeptides)-এ পরিবর্তিত করে। রেনিনের প্রভাবে দুগ্ধের প্রোটীন কেসিন (Casein)-এর তঞ্চন হয়। পাক-রসের লাইপেজ (Lipase) নামক স্নেহদ্রব্য-বিশ্লিষ্টকারী

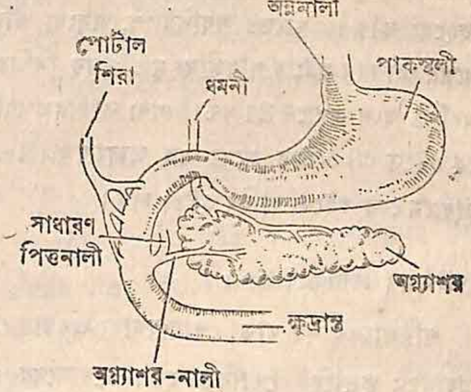
(Fat splitting) তৃতীয় একধরনের উৎসেচক স্নেহদ্রব্যের অবদ্রব(Emulsion)-কে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলে অংশতঃ পরিবর্তিত করে।

একবার পূর্ণমাত্রায় খাদ্যগ্রহণের পর পাকস্থলীতে খাদ্য সাধারণতঃ চার ঘণ্টা থাকে। অবশ্য, খাদ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ এবং ব্যক্তিবিশেষের খাদ্য হজম করার ক্ষমতার তারতম্যের জন্য, এই সময় কম-বেশি হইতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য, খুব অল্প কয়েকটি বস্তু যেমন, অ্যাল্‌কোহল(Alcohol) ইত্যাদি পাকস্থলীর প্রাকারে শোষিত হয়। পাকস্থলীতে খাদ্যের উপরি উক্ত আংশিক পরিপাকের ফলে খাদ্য অর্ধ-তরল অবস্থায় পৌছায়। এই অর্ধ-তরল খাদ্যকে **পাকমণ্ড** (Chyme) বলে।

ইহার পর পাকমণ্ড পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের সংযোগ-স্থলে অবস্থিত **পাইলোরিক কপাটিকা (Pyloric valve)**-র মধ্য দিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। ক্ষুদ্রান্ত্র প্রায় 762 সেন্টিমিটার লম্বা নলের মতো অংশ। ইহার প্রথম 25 সেন্টিমিটার লম্বা ভাগকে **গ্রহণী (Duodenum)**, মাঝের বেশির ভাগ অংশকে **জেজুনাম (Jejunum)** এবং শেষের 120 হইতে 150 সেন্টিমিটার অংশকে **নিম্নক্ষুদ্রান্ত্র (Ileum)** বলে। পাকমণ্ড গ্রহণীতে প্রবেশ করিলে, উহা গ্রহণীর প্রাকারে অবস্থিত অসংখ্য নলাকার গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে। ফলে, ঐ গ্রন্থি-গুলি হইতে **আন্ত্রিক রস (intestinal juice)** নামক পাচক রস নিঃসৃত হয়। এই পাচক রস ক্ষারীয় এবং ইহাতে কয়েকটি উৎসেচক থাকে। যেমন **ইরেপ্‌সিন (Erepsin)**—ইহা পাকস্থলীতে প্রোটীনের আংশিক পরিপাকের ফলে উৎপন্ন প্রোটীওজ ও পেপ্‌টোনকে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে; **ম্যাল্‌টেজ (Maltase)**, **সুক্রেজ (Sucrase)** এবং **ল্যাক্‌টেজ (Lactase)** এই তিনটি শ্বেতসার-বিশ্লিষ্টকারী উৎসেচক যথাক্রমে ম্যাল্‌টোজকে **গ্লুকোজ** (Glucose)-এ সুক্রোজকে **গ্লুকোজ** ও **ফ্রাক্‌টোজ**(Fructose)-এ এবং ল্যাক্‌টোজকে **গ্লুকোজ** ও **গ্যালাক্‌টোজ**(Galactose)-এ পরিণত করিয়া থাকে।

পাকমণ্ডের সঙ্গে আগত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাকারে অবস্থিত কোষকে উদ্দীপিত করিয়া, ঐ কোষগুলি হইতে **সিক্রেটিন (Secretin)** নামের হর্‌মোন নিঃসৃত হয়। সিক্রেটিন রক্ত-বাহিত হইয়া দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে। **অগ্ন্যাশয়** নামক (পাকস্থলীর নিচে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত ঘি রঙের) পাচক গ্রন্থিতে পৌছাইয়া, ঐ পাচক গ্রন্থিকে পাচক রস নিঃসরণ করিতে উদ্‌বুদ্ধ করে। ফলে, অগ্ন্যাশয় হইতে **অগ্ন্যাশয় রস (Pancreatic)**

juice) নিঃসৃত হয়। ঐ রস একটি নালীপথে গ্রহণীতে পৌছায়। সাধারণ মানুষ দৈনিক গড়ে 500 হইতে 1,000 ঘন সেন্টিমিটার অগ্ন্যাশয়-রস নিঃসরণ করে। এই স্বচ্ছ, হলুদাভ ক্ষারধর্মী পাচক রস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইহা পাকমণ্ডের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে প্রশমিত করিয়া মৃদু ক্ষার-ধর্মী করিয়া দেয়। অগ্ন্যাশয় রসের **ট্রিপ্‌সিন** (Trypsin) নামক প্রোটীন-বিশ্লিষ্টকারী উৎসেচক প্রোটীন এবং পলিপেপ্‌টাইডকে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। এই পাচক রসের দ্বিতীয় উৎসেচক **লাইপেজ** স্নেহদ্রব্যকে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলে পরিবর্তিত করে। তৃতীয় উৎসেচক **অ্যামাইলোপ্‌সিন (Amylopsin)** শ্বেতসারের পরিপাক সমাপ্ত করে।



19 নং চিত্র—মানুষের পাকস্থলী, গ্রহণী ও অগ্নাশয়

ক্ষুদ্রান্ত্রের গহ্বরে **পিত্ত (Bile)** নামের তৃতীয় একধরনের তরল আসিয়া পৌছায়। দেহের সবচেয়ে বড় পাচক গ্রন্থি **যকৃৎ (Liver)**-এ পিত্ত প্রস্তুত হয়, এবং **পিত্তস্থলী** বা **পিত্তাশয় (Gall bladder)**-এ সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে। পিত্তাশয় হইতে উৎপন্ন **পিত্তনালী (Bile duct)**-র মাধ্যমে দৈনিক গড়ে 500 হইতে 1,000 ঘন-সেন্টিমিটার পিত্ত ক্ষুদ্রান্ত্রের গহ্বরে বাহিত হয়। এই সবুজাভ হলুদ রঙের পাচক রসে, অবশ্য, কোনও উৎসেচক থাকে না। ইহা ক্ষারধর্মী এবং স্নেহদ্রব্যের অবদ্রব প্রস্তুত করিয়া (লাইপেজ) উৎসেচকের বিক্রিয়ার উপযোগী করিয়া দেয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, মুখ-বিবরে এবং পাকস্থলীতে আংশিক পরিপাক হইলেও, প্রধানতঃ ক্ষুদ্রান্ত্রেই খাদ্যের পরিপাক সম্পূর্ণ হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য সাধারণতঃ চার ঘণ্টা থাকে।

অপাচ্য অংশের বহিষ্করণ (Egestion)

ক্ষুদ্রান্ত্রের পরের অংশ **বৃহদন্ত্র**। খাদ্যের যে সমস্ত অংশ হজম হয় নাই, সেইগুলি, এবং খাদ্যের অপাচ্য অংশ ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। বৃহদন্ত্র

অপেক্ষাকৃত মোটা এবং লম্বায় প্রায় 152 সেন্টিমিটার। বৃহদন্ত্রে কোনও উৎসেচক নিঃসৃত হয় না। জল শোষণ করা এবং **মল** (Faeces) প্রস্তুত করা বৃহদন্ত্রের কাজ। খাদ্যের অবশিষ্টাংশ, অসংখ্য জীবাণু, শ্লেষ্মা (Mucus) এবং অন্ত্রের প্রাকার হইতে পরিত্যক্ত মৃত কোষ মিলিয়া মল প্রস্তুত হয়। খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ এখানে 24 ঘণ্টা অথবা তাহারও বেশি সময় থাকে। সাধারণতঃ 24 হইতে 48 ঘণ্টার মধ্যে **মল মলাশয়** (Rectum) ও **পায়ু** (Anus)-র মাধ্যমে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

শোষণ (Absorption)

পরিপাকের পর খাদ্য শোষণযোগ্য অবস্থায় পৌছায়। খাদ্যের পাচিত অংশ প্রধানতঃ ক্ষুদ্রান্ত্রেই শোষিত হয়। শোষণের পরিমাণ তলের উপর নির্ভর করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরের প্রাকারের চল্লিশ লক্ষের বেশি খুব সূক্ষ্ম আঙুলের মতো অভিক্ষেপ থাকে। ফলে, ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাকারের তলের আয়তন খুব বেশি (প্রায় দশ গুণ) হইয়া যায়। এই অভিক্ষেপগুলিকে **ভিলাই** (Villi) বলে। তলের আয়তন বেশি হওয়ায়, শোষণ-ক্ষমতাও বাড়িয়া যায়।



20 নং চিত্র—ভিলাসের গঠন।

প্রতিটি **ভিলাস**(Villus)-এর মধ্যে **ল্যাক্টিয়াল** (Lacteal) নামের একটি লসিকা-নালী(Lymphatic vessel) এবং উহাকে বেষ্টন করিয়া একটি রক্ত-জালক থাকে (20 নং চিত্র)। ভিলাসের এপিথিলিয়াম আভেদ্য পর্দা(Semipermeable membrane)-র কাজ করে। কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটীনের পরিপাকের ফলে যথাক্রমে উৎপন্ন মনোস্যাকারাইড (যেমন গ্লুকোজ, ফ্রাক্টোজ ইত্যাদি) এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড ভিলাসের এপিথিলিয়ামের মধ্য দিয়া আস্রবণ প্রক্রিয়ায় ভিলাসের রক্ত-জালকের মধ্যস্থ রক্তে পৌছায়। রক্ত জালক ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাকারে অবস্থিত হেপাটিক পোর্টাল শিরা (Hepatic portal vein)-র সঙ্গে যুক্ত। এই দুই ধরনের পাচিত খাদ্য হেপাটিক পোর্টাল শিরা-বাহিত হইয়া যকৃতে পৌছায়।

স্নেহদ্রব্যের পরিপাকের ফলে উৎপন্ন ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল একই
প্রক্রিয়ায় ল্যাকটিয়ালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, আবার স্নেহদ্রব্যে পরিণত হয়।
ল্যাকটিয়াল ক্ষুদ্রান্ত্রের বড় বড় লসিকা-নালীর এবং দেহের অন্যান্য লসিকা-নালীর
সঙ্গে মিলিত হইয়া **বামা রসকুল্যা** বা **মুখ্যা রসকুল্যা** (Thoracic duct)
নামের প্রধান লসিকা-নালী গঠন করে। ইহা হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি অঞ্চলে
শিরাতন্ত্রের সঙ্গে মিলিত হয়। অতএব, স্নেহদ্রব্য পরোক্ষভাবে রক্তে বাহিত
হইতে থাকে।

আত্তীকরণ (Assimilation)

পাচিত খাদ্য রক্ত-বাহিত হইয়া দেহের বিভিন্ন অংশে পৌছিলে, উহারা
(ক) ভাঙিয়া গিয়া শক্তি সরবরাহ করে, (খ) সঞ্চিত থাকিতে পারে, অথবা
(গ) প্রোটোপ্লাজ্‌ম গঠনে অংশগ্রহণ করে।

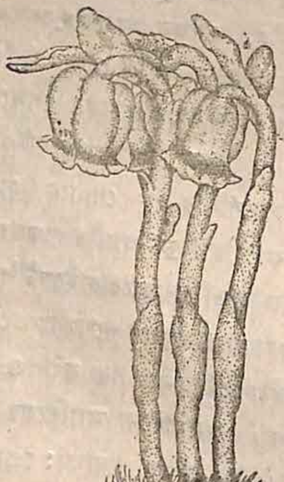
কার্বোহাইড্রেট পরিপাকের ফলের উৎপন্ন গ্লুকোজ যকৃতে গ্লাইকোজেন
হিসাবে সঞ্চিত থাকে। প্রয়োজনমতো, গ্লাইকোজেন আবার গ্লুকোজে পরিণত
হইয়া এবং রক্তের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া দেহের বিভিন্ন অংশে
চলিয়া যায়। গ্লুকোজের জারণে শক্তি মুক্ত হয়। দেহের পেশীতেও কিছু
পরিমাণে গ্লাইকোজেন সঞ্চিত থাকে। পেশীতে উৎপন্ন ল্যাকটিক অ্যাসিড
(Lactic acid) রক্ত-বাহিত হইয়া যকৃতে পৌছায় এবং সেখানে উহা গ্লাইকো-
জেনে পরিণত হয়। মাত্রাতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্যগ্রহণের ফলে
দেহে চর্বি জমিতে পারে। কারণ, প্রয়োজনাতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট এক অজ্ঞাত
পদ্ধতিতে স্নেহদ্রব্যে রূপান্তরিত হয়। স্নেহদ্রব্যের জারণে অপেক্ষাকৃত বেশি পরি-
মাণে শক্তি মুক্ত হয়। অতিরিক্ত স্নেহদ্রব্য চর্মের নিচে এবং হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, বৃক্ক
ও অন্ত্রের চারিদিকে পুরু স্তরে জমা হয়। অ্যামাইনো অ্যাসিডের জারণেও
প্রায় গ্লুকোজের মতো শক্তি উৎপন্ন হয়। ইহা, অবশ্য, প্রধানতঃ প্রোটোপ্লাজ্‌ম
তৈয়ারির কাজে লাগে। প্রয়োজনাতিরিক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড দেহে জমা
থাকে না—যকৃতের দ্বারা ইউরিয়া (Urea)-য় রূপান্তরিত হইয়া, রক্ত-বাহিত
হইয়া বৃক্কে পৌছায় এবং মূত্রের সঙ্গে দেহের বাহিরে চলিয়া যায়।

অন্যান্য পুষ্টি-পদ্ধতি (Other modes of nutrition)

হলোফাইটিক এবং হলোজোয়িক—এই দুই ধরনের প্রধান পুষ্টি-পদ্ধতির
মাঝামাঝি আরও কয়েক রকমের পুষ্টি-পদ্ধতি দেখা যায়।

যেমন—

অধিকাংশ ছত্রাক, অনেক জীবাণু সবুজ নয় বলিয়া, সালোকসংশ্লেষের দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না। ইহারা গলিত ও পচনশীল জৈব পদার্থ হইতে খাদ্য-সংস্থান করে। ইহাদের পুষ্টি-পদ্ধতিকে **মৃতজীবীয় পুষ্টি (Saprophytic nutrition)** বলে। এই ধরনের জীবকে **মৃতজীবী (Saprophytes)** বলা হয়। মৃতজীবীরা পচনশীল জৈব পদার্থ হইতে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটীন, স্নেহদ্রব্য—এই তিন ধরনের খাদ্য এবং খনিজ পদার্থের জলীয় দ্রবণ গ্রহণ করে। ইহারা প্রাণীদের মতো, দেহ হইতে নির্গত উৎসেচকের সাহায্যে খাদ্য পরিপাক করে। পাচিত খাদ্য দেহে শোষিত হয়। ইহার পর, স্বভোজী উদ্ভিদের মতো শোষিত খাদ্য হইতে অবশেষে অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং উহাদের আত্তীকরণ হয়।



21 নং চিত্র—মৃতজীবী উদ্ভিদ

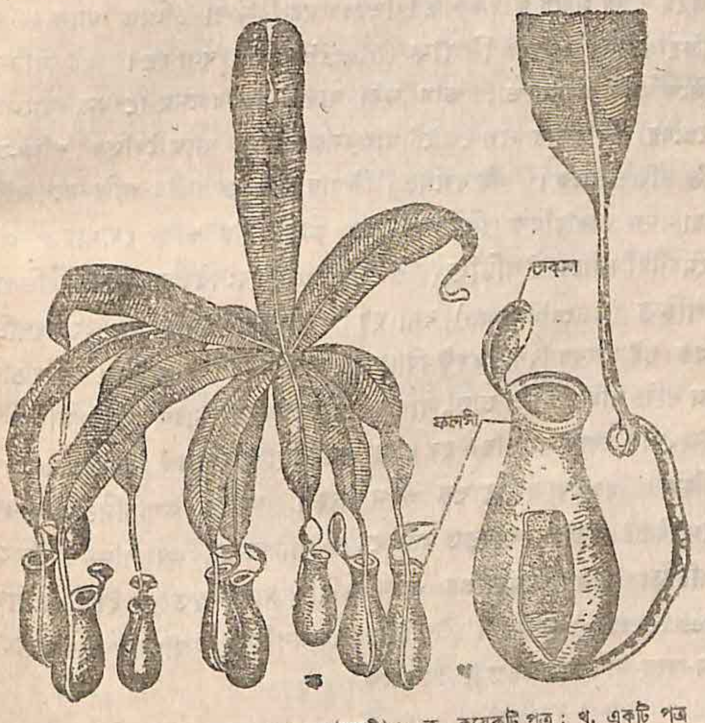


22 নং চিত্র—পরজীবী উদ্ভিদ (স্বর্ণলতা)

কয়েক ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী অন্য কোনও জীবিত উদ্ভিদ অথবা প্রাণীর দেহে আশ্রয় নেয় এবং আশ্রয়দাতার দেহ হইতে উহার (আশ্রয়দাতার) ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত খাদ্য শোষণ করিয়া পুষ্টিসাধন করে। আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ অথবা প্রাণীকে পোষক (Host), এবং পোষকের দেহে আশ্রয়-গ্রহণকারী ও খাদ্য-শোষণকারী জীবকে **পরজীবী (Parasite)** বলা হয়। পরজীবী পোষকের কম-বেশি ক্ষতি করে। অধিকাংশ পরজীবী উদ্ভিদ সবুজ নয় বলিয়া সালোকসংশ্লেষ দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না। সেইজন্য ইহারা পোষকের

খাদ্যে পুষ্ট হয়। স্বর্ণলতা (*Cuscuta*), বেনে-বৌ (*Orobanche*) ইত্যাদি পরজীবী উদ্ভিদের উদাহরণ। অধিকাংশ চ্যাপ্টা কৃমি এবং গোল কৃমি বিভিন্ন প্রাণীর অন্ত্রে ও অন্যান্য অঙ্গে বাস করে। এই সমস্ত পরজীবী প্রাণী পোষকের পাচিত খাদ্য শোষণ করিয়া পুষ্টিসাধন করে। পরজীবীদের এই পুষ্টি-পদ্ধতিকে **পরজীবীয় পুষ্টি (Parasitic nutrition)** বলা হয়। পরজীবীয় পুষ্টিতে খাদ্যের পরিপাক প্রয়োজন হয় না।

পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ (Insectivorous plants)-রা এক বিশেষ পদ্ধতিতে পুষ্টিসাধন করে। ইহারা অনেকাংশে স্বভোজী উদ্ভিদের মতো, কিন্তু প্রোটীন



23 নং চিত্র—পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ্ (ঘটপত্রী) : ক. কয়েকটি পত্র : খ. একটি পত্র (বিবর্ধিত ও কলসী কর্তিত)।

সংশ্লেষ করিতে পারে না। সেই কারণে, প্রোটীন-জাতীয় খাদ্যের জন্য ইহাদের কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণীর দেহের উপর নির্ভর করিতে হয়। যেমন—ঘটপত্রী উদ্ভিদ(Pitcher plant)-এর পত্র কলসীতে ও পাতা-ঝাঁঝি(Bladder-wort)-র পত্র ছোট থলিতে রূপান্তরিত হয়। আবার, সূর্য-শিশির (Sun-dew) নামক পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদের পত্রের কিনারায় অনেকগুলি কর্ষিকা (Tentacles) থাকে।

পতঙ্গ-ধরার ফাঁদে পতঙ্গ ধরা পড়িলে, ঐ সমস্ত অঙ্গ হইতে প্রোটীন-বিশ্লিষ্টকারী উৎসেচক বাহির হইয়া পতঙ্গের দেহস্থ প্রোটীনকে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। অ্যামাইনো অ্যাসিড কতকগুলি শোষণ-গ্রন্থির সাহায্যে শোষিত হয়।

বিপাক (Metabolism)

সালোকসংশ্লেষ, শ্বসন ইত্যাদি আলোচনা-প্রসঙ্গে উৎসেচকের উপস্থিতিতে নানাধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে। এই বিক্রিয়াগুলি জীবিত কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌মে সংঘটিত হয়। বস্তুতঃপক্ষে, জীবিত প্রোটোপ্লাজ্‌মে একই সময়ে কয়েক শত বিভিন্নধরনের বিক্রিয়া চলিতে থাকে। এই বিক্রিয়াগুলিকে একসঙ্গে **বিপাক (Metabolism)** বলা হয়। এই বিক্রিয়াগুলিকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। একধরনের (যেমন, সালোকসংশ্লেষের) বিক্রিয়ার ফলে প্রোটোপ্লাজ্‌মের মধ্যকার খাদ্যে স্থৈতিক শক্তি-রূপে শক্তি সঞ্চিত থাকে। এই ধরনের বিক্রিয়ায় ঐ শক্তি গতীয় শক্তি-রূপে বাহির হইয়া সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়। প্রথম ধরনের বিক্রিয়াকে **উপচিতি (Anabolism)** এবং দ্বিতীয় ধরনের বিক্রিয়াকে **অপচিত (Catabolism)** বলা হয়। অতএব, উপচিতি এবং অপচিতি নামক দুই ধরনের বিপরীতমুখী বিক্রিয়ার সমন্বয়ে বিপাক গঠিত। উপচিতির ফলে শক্তি সঞ্চিত হওয়া ছাড়া, সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত সরল যৌগ পদার্থ হইতে জটিল যৌগ পদার্থ সংশ্লেষিত হয়। কাজেই, ইহা গঠন-মূলক (Constructive) প্রক্রিয়া। ইহাতে জীবের শুষ্ক ওজন বাড়ে। আবার, অপচিতির ফলে জটিল যৌগ বিশ্লিষ্ট হইয়া অপেক্ষাকৃত সরল যৌগে পরিণত হয় এবং শক্তি বাহির হয়। অপচিতির ফলে জীবের শুষ্ক ওজন কমিয়া যায়; সুতরাং, ইহা ধ্বংসাত্মক (Destructive) প্রক্রিয়া। উপচিতি এবং অপচিতি, অর্থাৎ বিপাকের মাধ্যমে জীব-দেহে শক্তির সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

———

সংবহন ও রক্ত
(Circulation and Blood)

3

জীবের সমস্ত সজীব কোষে বিপাক হয়। বিপাকের জন্ম খাদ্য এবং অক্সিজেন প্রয়োজন। জীবনের সুস্থতা বজায় রাখার জন্ম বিপাকের ফলে উদ্ভূত দূষিত বর্জ্য পদার্থগুলি (Waste products)-র দূরীকরণও প্রয়োজন। যে উপায়ে জটিল গঠন-যুক্ত জীবের দেহের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে খাদ্য, অক্সিজেন, বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদি পৌছায়, তাহাকে **সংবহন** (Circulation) বলে। নিচের অনুচ্ছেদগুলিতে উদ্ভিদ এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর সংবহন সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা করা হইল।

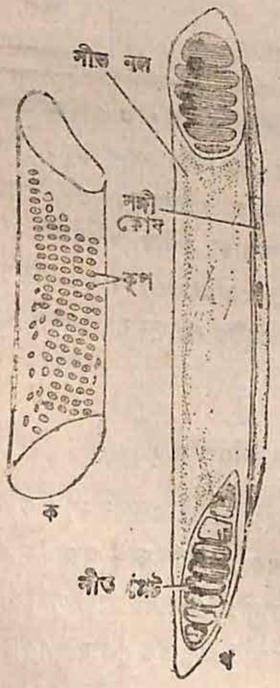
উদ্ভিদের সংবহন (Circulation in plants)

বলা বাহুল্য, এককোষী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সংবহনের প্রয়োজন হয় না। কারণ, খাদ্য-প্রস্তুতের জন্ম প্রয়োজনীয় জল, খনিজ লবণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং শ্বসনে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পরিবেশ হইতে সরাসরি কোষের মধ্যে গৃহীত হয় এবং বিপাকের ফলে উৎপন্ন অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড কোষ-প্রাকারের মাধ্যমে সরাসরি ব্যাপনের দ্বারা দেহের বাহিরে চলিয়া যায়। শেওলা (Algae) এবং ছত্রাক ইত্যাদি জটিলতা-বর্জিত বহুকোষী উদ্ভিদের সংবহনের জন্ম কোনও বিশেষ ব্যবস্থা নাই। কারণ, প্রয়োজনীয় গ্যাস (কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন) এবং খনিজের জলীয় দ্রবণ পরিবেশ হইতে দেহের পরিধিতে অবস্থিত কোষ-গুলিতে প্রবেশ করে। সেখান হইতে দেহের ভিতরের দিকে অবস্থিত কোষ-গুলিতে (গ্যাসীয় পদার্থগুলি) ব্যাপন এবং (জলীয় দ্রবণ) কোষান্তর আস্রবণ (Cell to cell osmosis)-এর দ্বারা পৌছায়।

উচ্চতর উদ্ভিদে, অবশ্য, সংবহনের জন্ম বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়। **সংবহন কলা** (Conducting tissues)-র মাধ্যমে উদ্ভিদ-দেহে জল ও খনিজ লবণের

দ্রবণ সংবাহিত হয়। এই কলা উদ্ভিদ-দেহের সমস্ত পরিণত অংশেই পাওয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ-বরাবর বিন্যস্ত থাকে। পত্রের শিরা-উপশিরাতে সংবহন-কলা থাকে।

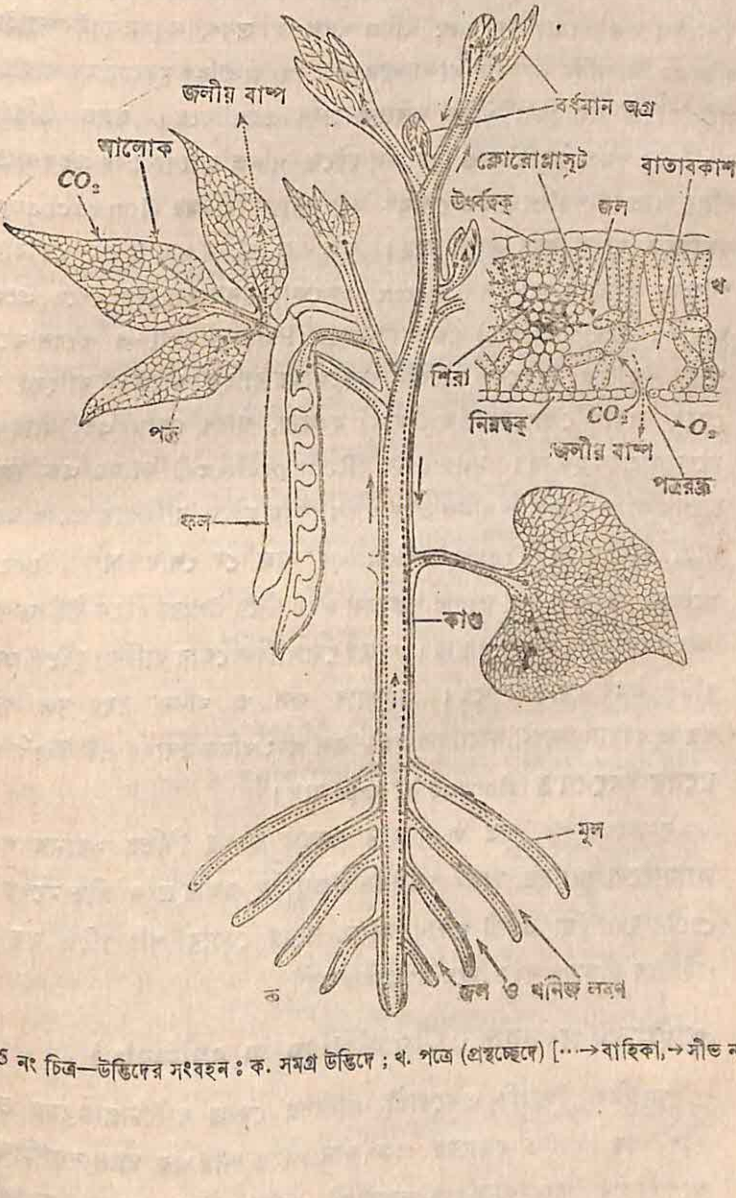
জাইলেম (Xylem) ও ফ্লোয়েম (Phloem)—এই দুই ধরনের কলাকে সংবহন-কলা বলা হয়। জাইলেম কলায় কয়েক ধরনের কোষ থাকে। ইহাদের মধ্যে কেবল **ট্রাকীড (Tracheid)** ও **ট্রাকীয়া (Trachea)** সংবহনে সরাসরি ভূমিকা নেয়। ট্রাকীড দুই-প্রান্তে সরু, মৃত কোষ। জল এবং খনিজের দ্রবণ একটি ট্রাকীড হইতে অন্য ট্রাকীডে সংবাহিত হয়।



24 নং চিত্র—উদ্ভিদের সংবহন কলা : ক. বাহিকা ; খ. সীভ নল ও সঙ্গী কোষ।

ট্রাকীড সাধারণতঃ ফার্ণ-জাতীয় উদ্ভিদ, ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ এবং কয়েক ধরনের গুপ্ত-বীজী উদ্ভিদে দেখা যায়। ট্রাকীয়ার অন্য নাম **বাহিকা (Vessel)**। ইহারাও লম্বাটে এবং মৃত কোষ। এই কোষগুলি একটির উপর আর একটি লম্বভাবে থাকে এবং উহাদের প্রস্থ-প্রাচীর দ্রবীভূত হইয়া যাওয়ায়, কোষগুলিকে একটি অবিচ্ছিন্ন নলের মতো দেখায়। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের সংবহন-কলায় বাহিকা থাকে।

ফ্লোয়েম কলায়ও নানাধরনের কোষ থাকে। ইহাদের মধ্যে **সীভ নল (Sieve tube)** সরাসরি এবং **সঙ্গী কোষ (Companion cell)** পরোক্ষভাবে সংবহনে অংশ নেয়। সীভ নলগুলি সজীব। ইহারা একটির উপর আরেকটি লম্বভাবে সাজানো থাকে। এই কোষগুলির প্রস্থ-প্রাচীরে অনেকগুলি রন্ধ্র থাকায়, প্রস্থ-প্রাচীরকে চালনী (Sieve)-র মতো দেখায়। ইহাকে চালনীচ্ছদা বা **সীভ প্লেট (Sieve plate)** বলা হয়। সঙ্গী কোষ সীভ নলের পাশে থাকে এবং সীভ নলকে সম্ভবতঃ সংবহনে সাহায্য করে।



25 নং চিত্র—উদ্ভিদের সংবহন : ক. সমগ্র উদ্ভিদে ; খ. পত্রে (প্রস্থচ্ছেদে) [···→বাহিকা, → সীভ নল]

পত্র এবং বর্ধমান অঞ্চল (মূল ও কাণ্ডের শীর্ষ, মুকুল) উদ্ভিদের বিপাক (খাদ্যপ্রস্তুত, শ্বসন ইত্যাদি)-এর প্রধান কেন্দ্রস্থল। কাজেই, এই অঞ্চলগুলিতে বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় জল, খনিজ পদার্থের দ্রবণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন ইত্যাদির সরবরাহ থাকা দরকার। স্থলজ উদ্ভিদ মূলরোমের সাহায্যে মাটি হইতে জল এবং খনিজ লবণের দ্রবণ গ্রহণ করে। জলজ উদ্ভিদরা সাধারণতঃ সমগ্র মূল ও কাণ্ড দিয়া জল হইতে খনিজ লবণের দ্রবণ গ্রহণ করে। উদ্ভিদ আস্রবণ পদ্ধতিতে জল শোষণ এবং আয়ন-বিনিময় (Ion-exchange) পদ্ধতিতে খনিজ লবণ গ্রহণ করে। জল এবং খনিজ লবণের দ্রবণ কোষান্তর আস্রবণ প্রক্রিয়ায় কর্টেক্স (Cortex)-এর কোষগুলির মধ্য দিয়া শেষে এণ্ডো-ডার্মিস (Endodermis)-এর পারণ কোষ (Passage cell)-এ প্রবেশ করে। পারণ কোষের ভিতরের দিকেই জাইলেমের বাহিকা থাকে। বাহিকা মৃত কোষ (অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজ্‌ম-বিহীন) হওয়ায়, পারণ কোষ এবং বাহিকার মধ্যে আস্রবণ হয় না। মূলজ প্রেষ (Root pressure) নামের এক বিশেষ চাপের সাহায্যে জল ও খনিজ দ্রবণ পারণ কোষ হইতে বাহিকায় প্রবেশ করে। পত্রে, বাষ্পমোচন (Transpiration)-এর ফলে যে শোষণ-চাপ (Suction pressure) সৃষ্টি হয়, তাহার জন্য জল ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠিতে থাকে এবং ক্রমে তাহা পত্রে পৌঁছায়। পত্রের মেসোফিল কোষ বাহিকা হইতে জল ও খনিজ দ্রবণ শোষণ করে। এইভাবে, জল ও খনিজ দ্রবণ মূল হইতে পত্র ও বর্ধমান অঞ্চলে সংবাহিত হয়। জল এবং খনিজ দ্রবণের এই ঊর্ধ্বগতিকে **রসের উৎস্রোত (Ascent of sap)** বলে।

সংশ্লেষের পর, পত্র ও বর্ধমান অঞ্চলে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরনের শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড ইত্যাদির জলীয় দ্রবণ সীভ নলের সীভ প্লেটের মধ্য দিয়া একটি কোষ হইতে পরের কোষে পরিবাহিত হয় এবং এইভাবে উদ্ভিদের সমস্ত অঙ্গে সংবাহিত হয়।

প্রাণীদের সংবহন (Circulation in animals)

অ্যামিবা ইত্যাদি এককোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে সাইটোপ্লাজ্‌মের চলনের ফলে খাদ্য প্রভৃতি কোষের এক স্থান হইতে আর এক স্থানে সঞ্চালিত হয়। অপেক্ষাকৃত সরল গঠন-যুক্ত বহুকোষী প্রাণীদের (যেমন স্পঞ্জ, একনালীদেহী প্রাণী এবং চ্যাপ্টা কৃমিদের) সংবহনের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নাই। পাচিত খাদ্য, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং বর্জ্য পদার্থ সরাসরি ব্যাপনের দ্বারা

দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়। কলা (Tissue) এবং যন্ত্র(Organ)-যুক্ত জটিল গঠনের প্রাণীদের দেহে সংবহনের জন্য নির্দিষ্ট **সংবহন-তন্ত্র** (Circulatory system) দেখা যায়। সংবহন-তন্ত্র মূলতঃ (ক) রক্ত (Blood), (খ) হৃৎপিণ্ড (Heart) অথবা উহার সমতুল্য কোনও যন্ত্র এবং (গ) **রক্তবাহ** (Blood vessels) নিয়া গঠিত। রক্তে তরল **রক্তরস** (Plasma) এবং **রক্তকণিকা** (Blood corpuscles) নামের বিশিষ্ট ধরনের কোষ থাকে।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের সংবহন (Circulation in invertebrates)

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্তে সাধারণতঃ রক্তকণিকার সংখ্যা খুব কম। ইহারা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্বেত রক্তকণিকার মতো। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্ত সচরাচর লাল হয় না। কারণ, ইহাতে লৌহ-ঘটিত শ্বাস-কণা হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) থাকে না। কিন্তু কেঁচো এবং আরও কয়েকটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত লাল। কেঁচোর রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে—তবে ইহা রক্তকণিকায় থাকে না, রক্তরসে দ্রবীভূত থাকে। চিংড়ি-জাতীয় প্রাণীদের রক্ত ঈষৎ নীলাভ। ইহাদের রক্তে তাম্র-ঘটিত শ্বাস-কণা হিমোসায়ানিন (Haemocyanin) থাকে।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড পৌষ্টিক নালীর পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত (26 নং চিত্র-ক)। আরসোলা ও অন্যান্য পতঙ্গের এবং অনেক সন্ধিপদী (Arthropoda)

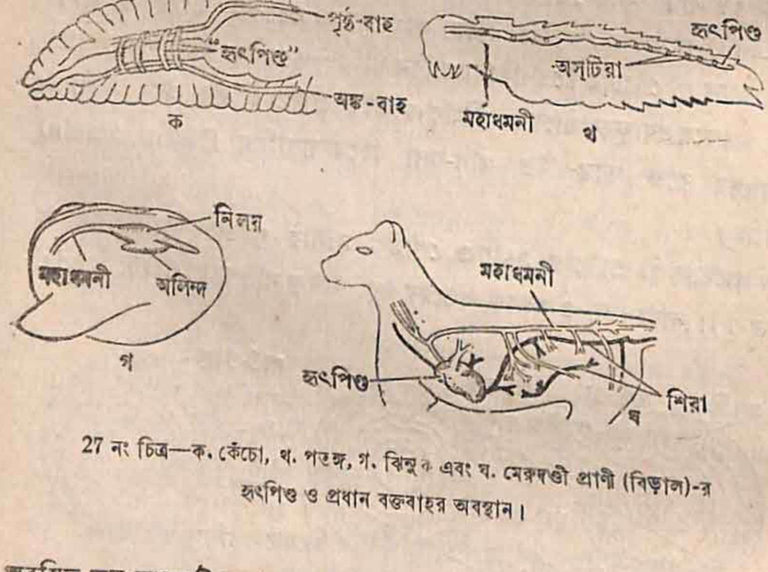


26 নং চিত্র—ক. পতঙ্গ ; খ. কেঁচো এবং গ. মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের আপেক্ষিক অবস্থান।

প্রাণীর হৃৎপিণ্ড সরু ও লম্বা নলের মতো (27নং চিত্র-খ)। ইহাতে কয়েক জোড়া রন্ধ্র থাকে। রন্ধ্রগুলিকে **অস্টিয়া** (Ostia) বলে। হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত **মহাধমনী** (Aorta) নামক প্রধান রক্তবাহে প্রবাহিত হয়। চিংড়ির হৃৎপিণ্ড

কতকটা ত্রিকোণাকার। ইহাতে পাঁচ জোড়া অস্টিয়া (Ostia) থাকে এবং ইহা হইতে মোট ছয়টি রক্তবাহ উৎপন্ন হয়। ঝিনুক (27নং চিত্র-গ), শামুক প্রভৃতি কম্বোজ (Mollusc) প্রাণীর হৃৎপিণ্ডে একটি অথবা দুইটি **অলিন্দ** (Auricles) এবং একটি পেশীময় **নিলয়** (Ventricle) থাকে। ইহাদের রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে একটি মহাধমনীতে প্রবাহিত হয়। কেঁচোর অগ্রভাগের দুই পাশে মোট চার জোড়া হৃৎপিণ্ড থাকে (27 নং চিত্র-ক)।

অধিকাংশ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে মহাধমনী এবং ধমনীর মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়িলেও, হৃৎপিণ্ডে ফেরার পথে রক্ত রক্তবাহর মধ্য দিয়া ফিরিয়া আসে না। রক্তবাহ হইতে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত নির্দিষ্ট প্রাকার-বিহীন ছোট ছোট ফাঁকা জায়গায় প্রবাহিত হয়। এই ফাঁকা জায়গাগুলিকে **গহ্বর** বা **ল্যাকুনী** (Lacunae) বলে। দেহের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত গহ্বরগুলি হইতে রক্ত অবশেষে হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি



27 নং চিত্র—ক. কেঁচো, খ. পতঙ্গ, গ. ঝিনুক এবং ঘ. মেরুদণ্ডী প্রাণী (বিড়াল)-র হৃৎপিণ্ড ও প্রধান রক্তবাহর অবস্থান।

অবস্থিত অল্প কয়েকটি অপেক্ষাকৃত বড় গহ্বর বা **সাইনাস**(Sinus)-এ আসিয়া জমা হয়। সেখান হইতে রক্ত অস্টিয়ার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। রক্ত রক্তবাহ হইতে ফাঁকা জায়গায় চলিয়া যায় বলিয়া, এই ধরনের সংবহন-তন্ত্রকে **মুক্ত সংবহন-তন্ত্র** (Open circulatory system) বলে। কেঁচো এবং আরও কয়েক ধরনের অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে, অবশ্য, **বদ্ধ সংবহন-তন্ত্র** (Closed

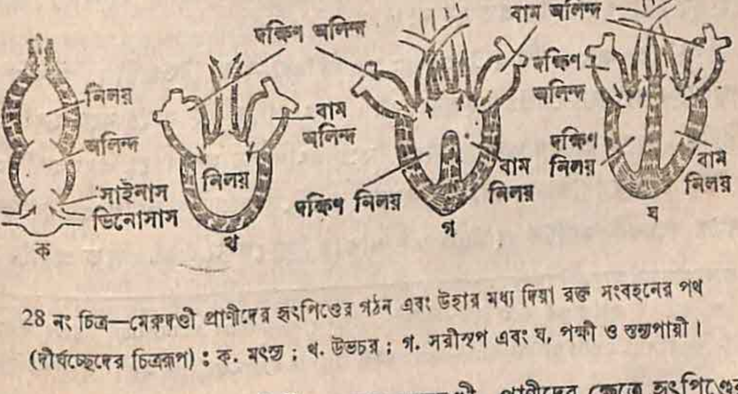
circulatory system) দেখা যায়। ইহাদের রক্ত রক্তবাহর বাহিরে প্রবাহিত হয় না। কেঁচোর দেহে কয়েকটি অনুদৈর্ঘ্য রক্তবাহ এবং প্রায় প্রতি দেহ-খণ্ডকে যুগ্ম অনুপ্রস্থ রক্তবাহ থাকে। চার জোড়া হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে, কেঁচোর দেহে রক্ত সংবাহিত হয়।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সংবহন (Circulation in vertebrates)

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সংবহন-তন্ত্র বদ্ধ শ্রেণীর। রক্ত, হৃৎপিণ্ড, রক্তবাহ এবং লসিকা ও লসিকাবহ—এইগুলি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সংবহনের সঙ্গে যুক্ত। রক্তের বিষয় এই পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদে পৃথক্‌ভাবে এবং লসিকা ও লসিকাবহের বিষয়ে মানুষের সংবহন-প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড, রক্তবাহ এবং রক্ত-সংবহনের বিষয়ে আলোচনা করা হইল।

হৃৎপিণ্ড (Heart)

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড পৌষ্টিক নালীর অঙ্কীয় ভাগে অবস্থিত (26নং চিত্র-গ)। ইহা, প্রকৃতপক্ষে, কাছাকাছি অবস্থিত কয়েকটি প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে গঠিত। পাতলা প্রকার-যুক্ত প্রকোষ্ঠকে হৃৎপিণ্ডের **অলিন্দ** (Auricle) এবং পুরু প্রাকার যুক্ত প্রকোষ্ঠকে **নিলয়** (Ventricle) বলা হয়। হৃৎপিণ্ড **হৃদ্ধরা ঝিল্লী** (Pericardium) নামের একটি পাতলা পর্দা দিয়া বেষ্টিত থাকে। গঠনের



28 নং চিত্র—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের গঠন এবং উহার মধ্য দিয়া রক্ত সংবহনের পথ (দীর্ঘচ্ছেদের চিত্ররূপ) : ক. মৎস্য ; খ. উভচর ; গ. সরীসৃপ এবং ঘ. পক্ষী ও স্তন্যপায়ী।

মূলগত ভিত্তি এক হইলেও, বিভিন্ন দলের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের গঠনে কম-বেশি পার্থক্য দেখা যায়। মৎস্য অর্থাৎ মাছেদের হৃৎপিণ্ডে (28 নং চিত্র-ক) মাত্র দুইটি প্রকোষ্ঠ (একটি অলিন্দ এবং একটি নিলয়) থাকে। ইহাদের

হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া অক্সিজেন-বিহীন রক্ত প্রবাহিত হয়। ব্যাঙ ইত্যাদি উভচর (Amphibians) প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডে (28 নং চিত্র-খ) দুইটি অলিন্দ এবং একটি নিলয় অর্থাৎ মোট তিনটি* প্রকোষ্ঠ থাকে। ইহাদের ফুস্‌ফুস হইতে আগত (অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে) অক্সিজেন-যুক্ত রক্ত বাম অলিন্দে, এবং দেহের অন্যান্য অংশ হইতে আগত অক্সিজেন-বিহীন† রক্ত দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে। নিলয়ে এই দুই ধরনের রক্ত মিশিয়া যায়। মিশ্রিত রক্ত শ্বাস-যন্ত্র এবং দেহের অন্যান্য অংশে সংবাহিত হয়। কাজেই, এই প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া মিশ্রিত রক্ত প্রবাহিত হয়। অধিকাংশ সরীসৃপ (Reptiles) অর্থাৎ টিকটিকি, সাপ, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রাণীদের নিলয় একটি প্রাকারের সাহায্যে অসম্পূর্ণভাবে দুইভাগে বিভক্ত (28 নং চিত্র-গ)। কাজেই, ইহাদেরও হৃৎপিণ্ড তিন প্রকোষ্ঠ-যুক্ত। সরীসৃপ, হইলেও কুমিরের হৃৎপিণ্ডে দুইটি অলিন্দ ও দুইটি নিলয় থাকে। পক্ষী (Birds) এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের (Mammals)-ও হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠ-যুক্ত (28 নং চিত্র-ঘ)। এই সমস্ত প্রাণীদের শ্বাস-যন্ত্র হইতে আগত অক্সিজেন যুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। সেখান হইতে বাম নিলয়ে, এবং বাম নিলয় হইতে দেহের বিভিন্ন অংশে সংবাহিত হয়। আবার, দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে অক্সিজেন-বিহীন রক্ত দক্ষিণ অলিন্দে পৌছিলে, সেখান হইতে উহা দক্ষিণ নিলয়ে, এবং দক্ষিণ নিলয় হইতে ফুস্‌ফুসে প্রবাহিত হয়। চার প্রকোষ্ঠের হৃৎপিণ্ড, প্রকৃতপক্ষে, দ্বৈত গঠন-বিশেষ—ইহার বাঁদিকে অক্সিজেন-যুক্ত এবং ডানদিকে অক্সিজেন-বিহীন রক্ত প্রবাহিত হয়; হৃৎপিণ্ডে এই দুই ধরনের রক্ত মিশ্রিত হয় না।

হৃৎপিণ্ড **হৃৎ-পেশী** (Cardiac muscles) দিয়া তৈয়ারী। নিয়মিত সঙ্কুচিত হওয়া হৃৎ-পেশীর সহজাত ধর্ম। হৃৎ-পেশীর এই ধর্মের ফলে হৃৎপিণ্ড নিয়মিত সঙ্কুচিত হয় এবং তাহারই ফলে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া, এবং হৃৎপিণ্ড হইতে দেহের বিভিন্ন অংশে, রক্ত সংবাহিত হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি কপাটক (Valves) থাকায় রক্ত কেবল একই দিকে প্রবাহিত

---

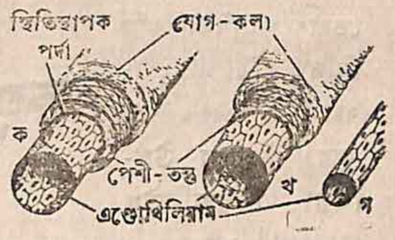
* ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত সাইনাস ভিনোসাস (Sinus venosus) এবং কনাস আর্টারিওসাস (Conus arteriosus)—এই দুইটি প্রকোষ্ঠ হৃৎপিণ্ডের অংশ নয়। ইহাদের হৃৎ-পিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আনুষঙ্গিক প্রকোষ্ঠ বলা যায়।

† ব্যাঙের মুখ-বিবর এবং চর্ম শ্বাস-যন্ত্রের কাজ করে। ঐ দুইটি অঞ্চল হইতে রক্ত আসিয়া দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে। কাজেই, ব্যাঙের দক্ষিণ অলিন্দের রক্তকে অক্সিজেন-বিহীন বলা ঠিক নয়।

হয়। মানুষের হৃৎপিণ্ড এবং উহার মধ্য দিয়া রক্ত-সংবহনের বর্ণনা-প্রসঙ্গে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

রক্তবাহ (Blood vessels)

রক্তবাহর মধ্য দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয়। রক্তবাহগুলি প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। একধরনের রক্তবাহ হৃৎপিণ্ড হইতে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত বহন করিয়া নিয়া যায়। ইহাদের **ধমনী (Arteries)** বলে। ধমনী **মহাধমনী** (Aorta) নামের অপেক্ষাকৃত বড় রক্তবাহ হইতে উৎপন্ন হয়। মহাধমনী আবার **অ্যাওর্টিক আর্চ** (Aortic arches) নামক রক্তবাহর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। ধমনীর সরু সরু শাখাকে **ধমনিকা** (Arteriole) বলে।



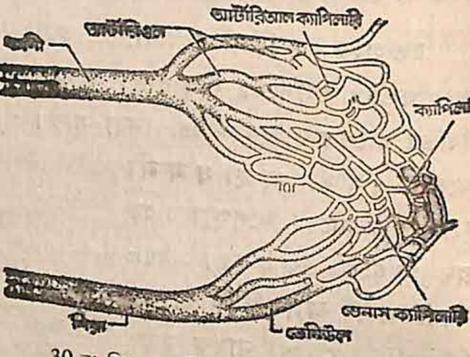
29 নং চিত্র—ক. ধমনী ; খ. শিরা ও গ. ক্যাপিলারির গঠন।

ধমনীর প্রাকারে তিনটি স্তর থাকে—বাহিরের স্তরটি যোগ-কলা (Connective tissue) দিয়া এবং মাঝের স্তরটি বৃত্তাকার পেশী দিয়া গঠিত। ভিতরের স্তরে একটি স্থিতিস্থাপক পর্দা এবং উহার সংলগ্ন এণ্ডোথিলিয়াম (Endothelium) নামের সরল আবরণী কলা থাকে। মহাধমনী এবং মোটা ধমনীর প্রাকারে যোগ-কলা এবং পেশীর স্তর খুব পুরু হয়। ধমনিকায় যোগ-কলার স্তর থাকে না। ধমনীর প্রাকার পুরু হওয়ায়, ইহাদের গহ্বর অপেক্ষাকৃত ছোট হয় এবং রক্তশূন্য ধমনীর গহ্বর বুজিয়া যায় না। ইহাদের মধ্য দিয়া উচ্চচাপ-যুক্ত রক্ত ঝাঁকানি দিয়া দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়। বড় ধমনীগুলি সচরাচর দেহের গভীর স্তরে থাকে। শ্বাস-যন্ত্রমুখী ধমনী ছাড়া অন্য সব ধমনীর মধ্য দিয়া অক্সিজেন-যুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়।

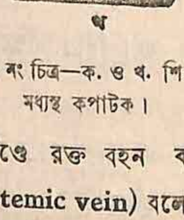
ধমনিকা হইতে একধরনের রক্তবাহ সৃষ্টি হয়। ইহাদের **আর্টারিআল ক্যাপিলারি** (Arterial capillary) বলে। ইহা হইতে আর একধরনের খুব সূক্ষ্ম রক্তবাহ সৃষ্টি হয়। ইহাদের **রক্ত-জালক** (Blood capillary), **জালক** বা **ক্যাপিলারি** (Capillary) বলে। জালকের প্রাকারে যোগ-কলা

ও পেশীর স্তর থাকে না। ইহাদের পাতলা প্রাকারে অনেকগুলি সঙ্কোচী কোষ এবং এণ্ডোথিলিয়াম থাকে। জালকের রক্ত এবং কলার মধ্যে গ্যাসীয় পদার্থ, পাচিত খাদ্য এবং বর্জ্য পদার্থের আদান-প্রদান হয়।

অনেকগুলি জালক মিলিয়া আর একধরনের সরু রক্তবাহ সৃষ্টি করে। ইহাদের **ভেনাস ক্যাপিলারি (Venous capillary)** বলা হয়। ভেনাস ক্যাপিলারিগুলি মিলিত হইয়া আর একধরনের রক্তবাহ সৃষ্টি করে। ইহাদের **উপশিরা** বা **ভেনিউল (Venule)** বলা হয়। অনেকগুলি ভেনিউল মিলিয়া **শিরা (Vein)** সৃষ্টি হয়। শিরাগুলি আরও একধরনের বড় রক্তবাহে মিলিত হয়। ইহাদের **মহাশিরা (Caval veins)** বলে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে সাধারণতঃ অগ্র-ভাগের দুই পাশে দুইটি **অগ্র-মহাশিরা (Precaval veins)** এবং পশ্চাৎ-ভাগের মধ্যরেখা-বরাবর একটি **পশ্চাৎ-মহাশিরা (Postcaval vein)** থাকে। মহাশিরাগুলি সরাসরি, অথবা **সাইনাস ভিনোসাস (Sinus venosus)** নামের একটি প্রকোষ্ঠের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ (মৎস্যদের ক্ষেত্রে একমাত্র) অলিন্দে প্রবেশ করে। **ফুস্‌ফুস-শিরা (Pulmonary veins)** পৃথক্‌ভাবে, অথবা যুক্ত হইয়া, হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। এইরকম যে শিরা কোনও অঙ্গ বা যন্ত্রের জালক হইতে উৎপন্ন হইয়া হৃৎপিণ্ডে রক্ত বহন করিয়া নিয়া যায়, তাহাকে **সিস্‌টেমিক শিরা (Systemic vein)** বলে। আর একধরনের শিরা রক্ত-জালক হইতে উৎপন্ন হইয়া হৃৎপিণ্ডে যাওয়ার পথে দ্বিতীয় কোনও যন্ত্রে জালকে বিভক্ত হয়। এই শিরাগুলিকে **পোর্টাল শিরা (Portal veins)** বলে। ধমনীর মতো, শিরার



30 নং চিত্র—ধমনী, ক্যাপিলারি ও শিরার সম্পর্ক।



31 নং চিত্র—ক. ও খ. শিরার মধ্যস্থ কপাটক।

প্রাকারেও তিনটি স্তর থাকে। তবে, ইহাদের পেশীস্তর অপেক্ষাকৃত পাতলা বলিয়া, প্রাকার পাতলা এবং গহ্বর অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া থাকে। সেইজন্য, রক্তশূন্য শিরার গহ্বর বুজিয়া যায়। শিরার গহ্বরে কপাটক থাকে। ইহাদের মধ্য দিয়া নিম্নচাপ-যুক্ত রক্ত সমভাবে এবং মৃদুগতিতে প্রবাহিত হয়। শ্বাস-যন্ত্র হইতে উৎপন্ন শিরা ছাড়া অন্য সব শিরার মধ্য দিয়া অক্সিজেন-বিহীন রক্ত প্রবাহিত হয়। শিরা সাধারণতঃ দেহের পরিধির দিকে থাকে এবং বাহির হইতে শিরার অস্তিত্ব বোঝা যায়।

রক্ত-সংবহন (Circulation of blood)

বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত-সংবহনের পথ মূলতঃ একই ধরনের এবং অনেকাংশে মানুষের মতো (পরে দ্রষ্টব্য)। তবে, হৃৎপিণ্ডের গঠন এবং শ্বাস-যন্ত্রের প্রকৃতি (ফুল্‌কা অথবা ফুসফুস) অনুযায়ী, বিভিন্ন দলের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্ত-সংবহনের পথের কম-বেশি পার্থক্য দেখা যায়।

মানুষের সংবহন (Circulation in man)

অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সংবহনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গঠনাদি মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নিচে মানুষের হৃৎপিণ্ড, রক্ত-সংবহন, লসিকা, লসিকাবহ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

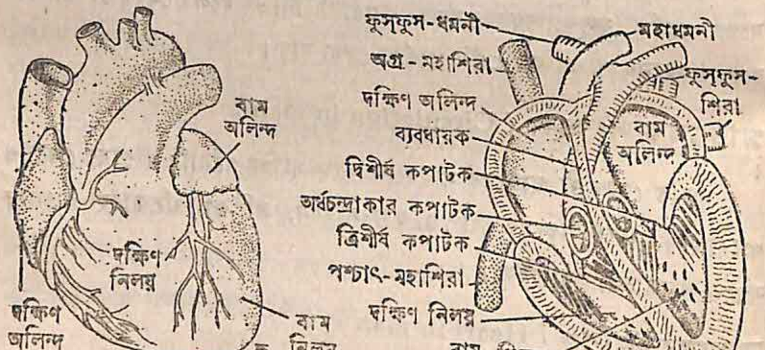
মানুষের হৃৎপিণ্ড (Heart in man)

মানুষের হৃৎপিণ্ড বক্ষ-গহ্বরের মাঝামাঝি (অল্প বাঁদিক ঘেঁষিয়া) ফুসফুস দুইটির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। অন্য সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতো, মানুষের হৃৎপিণ্ড দুইটি অলিন্দ এবং দুইটি নিলয় দিয়া গঠিত (32 নং চিত্র)।

হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া সংবহন (Circulation through the heart)

দেহের অগ্র-ভাগ হইতে আগত অক্সিজেন-বিহীন রক্ত অগ্র-মহাশিরা (Precaval veins)-র মাধ্যমে এবং দেহের পশ্চাৎ-ভাগের রক্ত পশ্চাৎ-মহাশিরা(Postcaval veins)-র মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দ পূর্ণ করে। একই সময়ে, ফুস্‌ফুস-শিরা(Pulmonary veins)-র মধ্য দিয়া ফুস্‌ফুস হইতে আগত অক্সিজেন-যুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দ পূর্ণ করে। রক্ত-পূর্ণ হইলে (33 নং চিত্র-ক), অলিন্দ দুইটি একই সঙ্গে সঙ্কুচিত হয়। ইহাতে অলিন্দ দুইটির মধ্যের রক্তের চাপ বাড়িয়া যায় এবং ফুস্‌ফুস-শিরা ও মহা-

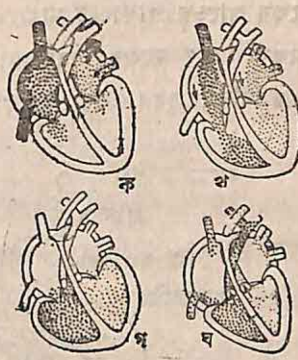
শিরার কপাটক বন্ধ হইয়া যায়। ফলে, রক্ত অলিন্দ হইতে ফুসফুস-শিরা ও মহাশিরায় ফিরিয়া যাইতে পারে না। উচ্চচাপ-যুক্ত রক্ত তখন বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের সংযোগ-স্থলে অবস্থিত **দ্বিশীর্ষ কপাটক**(Bicuspid valve)-কে ঠেলিয়া বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। তেমনিভাবে, দক্ষিণ অলিন্দ ও দক্ষিণ নিলয়ের সংযোগ-স্থলে অবস্থিত **ত্রিশীর্ষ কপাটক**(Tricuspid valve)-কে ঠেলিয়া রক্ত দক্ষিণ অলিন্দ হইতে দক্ষিণ নিলয়ে প্রবেশ করে (33 নং চিত্র-খ)। রক্ত-পূর্ণ হওয়ার পর, নিলয় দুইটি সঙ্কুচিত হইতে শুরু করে। ইহাতে নিলয় দুইটির মধ্যস্থ রক্তের চাপ ক্রমেই বাড়িতে থাকে; ফলে, দ্বিশীর্ষ ও ত্রিশীর্ষ কপাটক বন্ধ হইয়া যায় (33 নং চিত্র-গ) এবং রক্ত নিলয় হইতে অলিন্দে ফিরিয়া যাইতে পারে না। নিলয়ে রক্তের চাপ আরও (অর্থাৎ, ধমনীর মধ্যস্থ রক্তের



32 নং চিত্র—মানুষের হৃৎপিণ্ডের গঠন : ক. সমগ্র হৃৎপিণ্ড ; খ. দীর্ঘচ্ছেদ।

চাপের) বেশি হইলে, দক্ষিণ অলিন্দ হইতে উৎপন্ন **পাল্‌মোনারি আর্চ** (Pulmonary arch)-এর শুরুতে অবস্থিত **অর্ধচন্দ্রাকার কপাটক** (Semilunar valves) ঠেলিয়া অক্সিজেন-বিহীন রক্ত দক্ষিণ নিলয় হইতে পাল্‌মোনারি আর্চের মধ্যে প্রবেশ করে। একইভাবে, একই সময়ে, বাম নিলয় হইতে অক্সিজেন-যুক্ত রক্ত বাম নিলয় হইতে উৎপন্ন **অ্যাওর্টিক আর্চ** (Aortic arch)-এর শুরুতে অবস্থিত অর্ধচন্দ্রাকার কপাটক ঠেলিয়া ঐ আর্চের মধ্যে প্রবেশ করে (33 নং চিত্র-ঘ)। ইহার মধ্যে অলিন্দ দুইটি আবার রক্ত-পূর্ণ হয়, আবার হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন শুরু হয় এবং উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটে। হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলির ক্রমিক সঙ্কোচন

(যখন রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে আর্‌চে প্রবেশ করে) এবং শ্লথন(যখন অলিন্দ দুইটি রক্ত-পূর্ণ হয়)-এর ফলে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট পথে রক্ত প্রবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও শ্লথনকে যথাক্রমে **সিস্টোল** (Systole) এবং **ডায়াস্টোল** (Diastole) বলে। হৃৎপিণ্ডের একবার সঙ্কোচন ও একবার শ্লথনকে একসঙ্গে **হৃদ্‌ঘাত** (Heart beat) বলা হয়। সুস্থ মানুষের হৃদ্‌ঘাতের হার মিনিটে 72 বার। আমৃত্যু হৃৎ-স্পন্দন চলে।



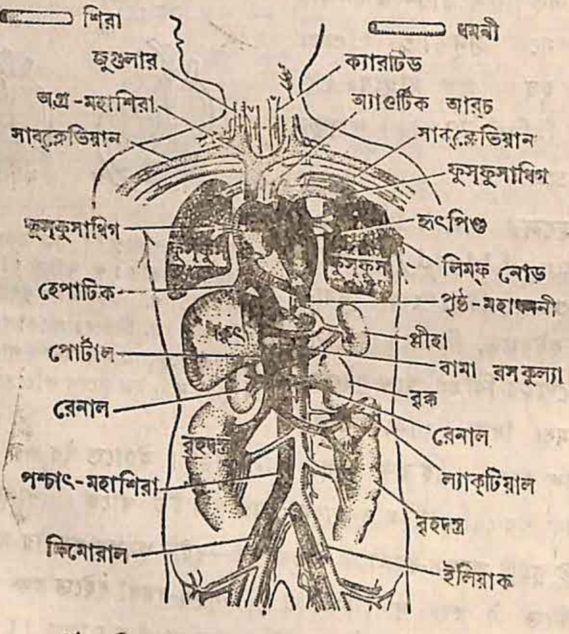
৪৪ নং চিত্র—মানুষের হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া সংবহনের পদ্ধতি : ক. অলিন্দ দুইটি রক্ত-পূর্ণ হইতেছে ; খ. রক্ত নিলয় দুইটিতে প্রবেশ করিতেছে ; গ. নিলয়ের সংকোচনে কপাটক বন্ধ হইতেছে ; ঘ. মহাধমনী ও পাল্‌মোনারি আর্‌চের মধ্যে রক্ত প্রবেশ করিতেছে।

রক্ত-সংবহনের পথ (Path of circulation of blood)

হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া সংবহন বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, কিভাবে (ফুস্‌ফুস ছাড়া) রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া পাল্‌মোনারি আর্‌চে প্রবেশ করে। এই রক্ত কাল্‌চে লাল রঙের। ইহাতে খুব অল্প পরিমাণ অক্সিজেন এবং খুব বেশি পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে। পাল্‌মোনারি আর্‌চ শীঘ্রই দুইটি ফুস্‌ফুস-ধমনীতে বিভক্ত হয়—দুইটি ফুস্‌ফুস-ধমনীর মধ্য দিয়া ফুস্‌ফুস দুইটিতে ঐ রক্ত সংবাহিত হয়। ফুস্‌ফুস-ধমনী হইতে রক্ত অবশেষে ফুস্‌ফুসের অ্যাল্‌ভিওলাসের চারদিকে অবস্থিত অসংখ্য রক্ত-জালক(33 নং চিত্র-খ)-এর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ার সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে এবং অক্সিজেন গ্রহণ করে। সেখান হইতে রক্ত ফুস্‌ফুস-শিরার মাধ্যমে আবার হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে ফিরিয়া আসে। এই রক্ত উজ্জ্বল লাল রঙের, কার্বন ডাই-অক্সাইড-বিহীন এবং অক্সিজেন-পূর্ণ। এইভাবে রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে ফুস্‌ফুসে এবং ফুস্‌ফুস হইতে হৃৎপিণ্ডে সংবাহিত হয়। এই সংবহনকে **ফুস্‌ফুস-সংবহন (Pulmonary circulation)** বলা হয়।

কিভাবে বাম অলিন্দ হইতে অক্সিজেন-পূর্ণ রক্ত অবশেষে অ্যাওর্টিক আর্‌চের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা আগে (62 পৃষ্ঠায়) বলা হইয়াছে। অ্যাওর্টিক আর্‌চ উপরের দিকে মহাধমনী নামে পরিচিত। মহাধমনী হইতে কয়েকটি মোটা মোটা ধমনী, এবং ঐ ধমনীগুলি হইতে অনেক সরু সরু ধমনী উৎপন্ন হয়। এই

ধমনীগুলির মাধ্যমে অক্সিজেন- পূর্ণ রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে সংবাহিত হয়। রক্ত ধমনী হইতে ধমনিকায় এবং সেখান হইতে রক্ত-জালকে প্রবেশ করে। রক্ত-জালকের আভেদ্য প্রাকারের মাধ্যমে ব্যাপন-পদ্ধতিতে কলার কোষ এবং রক্ত-জালকের মধ্যস্থ রক্তের মধ্যে গ্যাস, জল এবং লবণ ও দ্রাব্য জৈব পদার্থের দ্রবণের বিনিময় হয়। এইভাবে, কোষের শ্বসনে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড রক্তে



34 নং চিত্র—মানুষের প্রধান প্রধান রক্তবাহর বিন্যাস-ব্যবস্থা।

প্রবেশ করে এবং অক্সিজেন রক্ত হইতে কলার কোষে পৌছায়। রক্ত রক্ত-জালক হইতে উপশিরায়, সেখান হইতে শিরায় এবং শিরা হইতে অবশেষে অগ্র-মহাশিরা এবং পশ্চাৎ-মহাশিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ড হইতে দেহ-কলা এবং সেখান হইতে হৃৎপিণ্ডে রক্ত-সংবহনকে **সিস্টেমিক সংবহন (Systemic circulation)** বলা হয়।

উদর-অঞ্চলে, ধমনীর রক্ত পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাকারে অবস্থিত রক্ত-জালকে প্রবেশ করে। সেখান হইতে রক্ত এক জটিল পথে হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটীন পরিপাকের ফলে যথাক্রমে উৎপন্ন মনো-স্যাকারাইড ও অ্যামাইনো অ্যাসিড পৌষ্টিক নালীর প্রাকারে অবস্থিত রক্ত-

জালকের রক্তে শোষিত হইয়া হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে যকৃতে পৌছায়। ঐ রক্ত আবার যকৃতের রক্ত-জালকের মধ্যে পরিবাহিত হয়। এইখানে রক্ত হইতে খাদ্য যকৃতের কোষে চলিয়া যায় এবং সেখানে সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে। রক্ত যকৃতের রক্ত-জালক হইতে যকৃৎ-শিরা(Hepatic vein)-র মাধ্যমে মহাশিরায়, এবং সেখান হইতে হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। পোর্টাল শিরার মাধ্যমে এই সংবহনকে **পোর্টাল সংবহন** (Portal circulation) বলে।

লসিকা ও লসিকাবহ (Lymph and lymphatics)

আগে বলা হইয়াছে যে, রক্ত-জালকের রক্ত এবং কলার কোষের মধ্যে ব্যাপন-পদ্ধতিতে গ্যাস ও অন্যান্য পদার্থের বিনিময় হয়। এই বিনিময়, অবশ্য, সরাসরি হয় না। কারণ, কলার কোষের চারদিকে একরকম তরল পদার্থ থাকে। ইহাকে **কলা-রস** (Tissue fluid) বা **লসিকা** **(Lymph)** বলা হয়। কলার কোষ এবং রক্ত-জালকের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থিত লসিকা, রক্ত এবং কোষের মধ্যে গ্যাস ও দ্রবণের ব্যাপনে সাহায্য করে; অর্থাৎ, রক্ত হইতে লসিকায় এবং লসিকা হইতে কোষে, আবার কোষ হইতে লসিকায় এবং সেখান হইতে রক্ত-জালকের রক্তে—এইভাবে ব্যাপন হয়।



35 নং চিত্র—কলায় লসিকা-নালী, কোষ ও ক্যাপিলারির সম্পর্ক।

লসিকা বর্ণহীন তরল-বিশেষ। ইহা আসলে রক্তরসেরই অংশ(যে অংশ রক্ত-জালকের প্রাকার ভেদ করিয়া বাহিরে আসে)-মাত্র। ইহাতে, অবশ্য, রক্ত-রসের কয়েকটি প্রোটীন থাকে না। লসিকায় লিম্ফোসাইট (Lymphocytes) নামে শ্বেত রক্তকণিকা থাকে।

কলার কোষগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লসিকা-পূর্ণ অঞ্চল থাকে (35 নং চিত্র)। এই অঞ্চলগুলি মিলিত হইয়া সূক্ষ্ম প্রাকার-যুক্ত **লসিকা-নালী** **(Lymph vessels)**, **লসিকায়নী** বা **লসিকাবহ** **(Lymphatics)** গঠন করে। বক্ষ-অঞ্চলে লসিকাবহগুলি মিলিত হইয়া একটি অপেক্ষাকৃত বড় লসিকা-নালী সৃষ্টি করে। ইহাকে **বামা রসকুল্যা** **(Thoracic duct)** বলে (34 নং

চিত্র)। হৃৎপিণ্ডের নিকটে, বামা রসকুল্যা একটি বড় শিরার মধ্যে মুক্ত হয়। দেহের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত লসিকাবহগুলির স্থানে স্থানে ফোলা অংশ দেখা যায়। ইহাদের **লসিকা পর্ব** বা **লিম্ফ নোড (Lymph nodes)** বলা হয়।

কোষ ও রক্তের মধ্যে ব্যাপনে সাহায্য করা ছাড়া, রোগাক্রমণ প্রতিরোধ করা লসিকার কাজ। 46 পৃষ্ঠায় বর্ণিত ল্যাকৃটিয়ালগুলি লসিকাতন্ত্র(Lymphatic system)-এর অংশ-বিশেষ। অতএব, লসিকার মাধ্যমেই অন্ত্রের প্রাকার হইতে শোষিত স্নেহদ্রব্য রক্তে সংবাহিত হয়। লসিকা পর্বে লিম্ফোসাইট উৎপন্ন হয়।

প্রধানতঃ নড়াচড়া এবং অংশতঃ অভিকর্ষজ বলের প্রভাবে দেহে লসিকা সংবাহিত হয়। রক্ত-জালকের রক্ত হইতে ক্রমাগত রক্তের তরল অংশ বাহির হইয়া যাওয়ায়, রক্তে তরল অংশ কমিয়া যাইতে পারে। তবে, বামা রসকুল্যা-পথে লসিকা আবার রক্তে ফিরিয়া আসায়, রক্তের আয়তন বজায় থাকে।

রক্ত (Blood)

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্ত একধরনের বিশিষ্ট যোগ-কলা; তরল **রক্তমস্ত** বা **রক্তরস (Plasma)** ইহার ধাত্র, এবং **রুধিরকণিকা** বা **রক্তকণিকা (Blood corpuscles)** ইহার কোষ-অংশ। নিচে প্রধানতঃ মানুষের (প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর) রক্তরস ও বিভিন্ন রক্তকণিকার গঠন, কাজ ইত্যাদি বলা হইল।

রক্তরস (Plasma)

রক্তরস প্রায় বর্ণহীন (ঈষৎ হলুদ রঙের), স্বচ্ছ, মৃদু ক্ষারীয় তরল-বিশেষ। মানুষের রক্তের প্রায় 60%-ই রক্তরস। ইহাতে প্রায় 92% জল থাকে। রক্তরসে জল ছাড়া (ক) প্রায় 0·9% খনিজ লবণ (প্রধানতঃ সোডিয়াম ক্লোরাইড); (খ) কয়েক ধরনের প্রোটীন, যেমন—ফাইব্রিনোজেন (Fibrinogen), সিরাম অ্যাল্‌বুমিন (Serum albumin), সিরাম গ্লোবিউলিন (Serum globulin), লাইসিন (Lycin); (গ) অ্যামাইনো অ্যাসিড, স্নেহদ্রব্য, গ্লুকোজ ইত্যাদি খাদ্য; (ঘ) ইউরিয়া (Urea), ইউরিক অ্যাসিড (Uric acid) ও অন্যান্য রেচন-পদার্থ; (ঙ) অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড নামের গ্যাসীয় পদার্থ; (চ) হর্‌মোন এবং (ছ) ভাইটামিন প্রভৃতি নানারকম দ্রব্য দ্রবীভূত অথবা ভাসমান অবস্থায় (যেমন—স্নেহদ্রব্য) থাকে।

রক্তকণিকা (Blood corpuscles)

রক্তে তিন ধরনের রক্তকণিকা থাকে ; যেমন—(1) লোহিত রক্তকণিকা, (2) শ্বেত রক্তকণিকা এবং (3) অণুচক্রিকা। নিচে ইহাদের বিষয় বলা হইল।

লোহিত রক্তকণিকা (Red blood corpuscles)

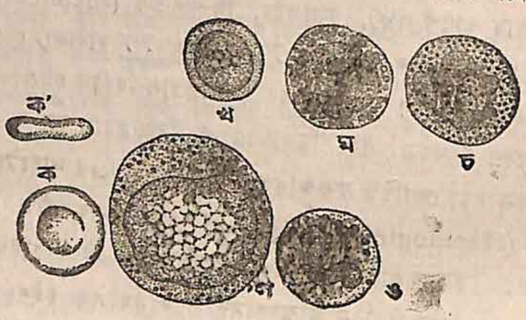
লোহিত রক্তকণিকা(Red Blood Corpuscles)-কে ইংরেজীতে সংক্ষেপে R. B. C. বলে। ইহার অপর নাম **ইরাইথ্রোসাইট** (Erythrocytes)। এই রক্তকণিকাগুলি সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি (এক ঘন মিলিমিটার মানুষের রক্তে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ), বৃত্তাকার, দ্বি-অবতল (Biconcave) এবং আকারে ছোট (1·9 মাইক্রা* পুরু, ব্যাস 7·5 হইতে 7·7 মাইক্রা)। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের লোহিত রক্তকণিকা বৃত্তাকার এবং নিউক্লিয়াস-বিহীন হইলেও, অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে ইহা ডিম্বাকার ও নিউক্লিয়াস-যুক্ত। শ্বসনের জন্য অক্সিজেন বহন করা লোহিত রক্তকণিকার কাজ। ইহাদের সাইটোপ্লাজ্মে **হিমোগ্লোবিন** (Haemoglobin) নামের লাল রঙের লৌহ-ঘটিত প্রোটীন (শ্বাস-কণা) থাকায়, দলবদ্ধভাবে ইহাদের লাল দেখায়। এই কারণেই রক্তের রঙ লাল। শ্বাস-যন্ত্রে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হইয়া **অক্সিহিমোগ্লোবিন** (Oxyhaemoglobin) নামের উজ্জ্বল লাল রঙের অস্থিত যৌগ গঠন করে। কলার আম্লিক মাধ্যমে অক্সিহিমোগ্লোবিন বিজারিত হইয়া আবার হিমোগ্লোবিনে পরিণত এবং অক্সিজেন-মুক্ত হইয়া যায়। এইভাবে লোহিত রক্তকণিকা রক্তরসের তুলনায় প্রায় 40 গুণ বেশি অক্সিজেন বহন করে। মানুষের লোহিত রক্তকণিকা অস্থি-মজ্জায় উৎপন্ন হয়, এবং 120 দিন পর্যন্ত রক্তে থাকার পর, প্লীহায় বিনষ্ট হয়।

শ্বেত রক্তকণিকা (White blood corpuscles)

শ্বেত রক্তকণিকা(White Blood Corpuscles)-কে ইংরেজীতে সংক্ষেপে W. B. C. বলা হয়। ইহার অপর নাম **লিউকোসাইট** (Leucocytes)। এই রক্তকণিকাগুলি সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম—এক ঘন মিলিমিটার মানুষের রক্তে পাঁচ হাজার হইতে নয় হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। ইহারা বর্ণহীন এবং নিউক্লিয়াস-যুক্ত। শ্বেত রক্তকণিকা সাধারণতঃ 12 হইতে 13 দিন বাঁচিয়া থাকে। আয়তন এবং সাইটোপ্লাজ্ম ও নিউক্লিয়াসের প্রকৃতি অনুযায়ী,

*মাইক্রা (Micra)—বহুবচন ; মাইক্রন (Micron)—একবচন। 1 মাইক্রন=0·001 মিলিমিটার।

শ্বেত রক্তকণিকা প্রধানতঃ দুই ধরনের। যেমন—(ক) **আগ্রানুলোসাইট** (Agranulocytes) এবং (খ) **গ্রানুলোসাইট** (Granulocytes)। প্রথম ধরনের শ্বেত রক্তকণিকাগুলির বড় এবং গোল নিউক্লিয়াস থাকে। বেশি সাইটোপ্লাজ্‌ম-যুক্ত আকারে বড় (ব্যাস 12 হইতে 15 মাইক্রা) আগ্রানুলো-সাইটকে **মনোসাইট** (Monocytes) বলে। মোট শ্বেত রক্তকণিকার 2% হইতে 6% মনোসাইট। ইহারা স্বয়ংচল, রক্ত জালকের বাহিরে চলিয়া আসিতে পারে এবং ফ্যাগোসাইটোসিস (Phagocytosis) পদ্ধতিতে (ক্ষণপাদের সাহায্যে) রোগ-জীবাণু ও বিনষ্ট কোষের ভগ্নাংশ কোষের মধ্যে গ্রহণ করে।



36 নং চিত্র—মানুষের রক্তকণিকাঃ ক. লোহিত রক্তকণিকা (পৃষ্ঠ-দৃশ্য) ; ক'. ঐ (পার্শ্ব-দৃশ্য) ; খ. লিম্ফোসাইট ; গ. মনোসাইট ; ঘ, ঙ. ও চ. তিন ধরনের গ্রানুলোসাইট।

প্লীহা এবং অস্থি-মজ্জায় মনোসাইট উৎপন্ন হয়। কম সাইটোপ্লাজ্‌ম-যুক্ত, আকারে ছোট (ব্যাস 6 হইতে 10 মাইক্রা) আগ্রানুলোসাইটকে **লিম্ফোসাইট** (Lymphocytes) বলা হয়। মোট শ্বেত রক্তকণিকার 20% হইতে 25% লিম্ফোসাইট। রোগ প্রতিরোধ করা ইহাদের কাজ। ইহারা প্লীহা এবং লসিকা পর্বে উৎপন্ন হয়। গ্রানুলোসাইটদের নিউক্লিয়াস দুইটি কিংবা তাহার বেশি খণ্ডে বিভক্ত এবং খণ্ডগুলি সুতার মতো অংশ দিয়া পরস্পর যুক্ত থাকে। ইহাদের সাইটোপ্লাজ্‌ম দানাদার। ইহারাও রক্ত-জালকের বাহিরে চলিয়া আসিতে এবং ক্ষণপাদ বিস্তার করিতে পারে। রোগ-জীবাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ইহাদের কাজ। এই ধরনের রক্তকণিকা অস্থি-মজ্জায় উৎপন্ন হয়।

অণুচক্রিকা (Blood plateletes)

অণুচক্রিকা(Blood Plateletes)-কে **থ্রম্বোসাইট**(Thrombo-cytes)-ও বলা হয়। ইহারা লোহিত রক্তকণিকার চেয়েও ছোট (2 হইতে 4

মাইক্রো ব্যাস-যুক্ত), প্রতিসরণশীল এবং নিউক্লিয়াস-বিহীন। ইহা রক্তের তঞ্চন বা জমাট-বাঁধায় সাহায্য করে এবং অস্থি-মজ্জায় উৎপন্ন হয়।

রক্ত ও সংবহন-প্রসঙ্গে **প্লীহা (Spleen)** উল্লেখযোগ্য যন্ত্র। ইহা যে কেবল শ্বেত রক্তকণিকা উৎপন্ন এবং লোহিত রক্তকণিকা বিনষ্ট করে তাহাই নয়, ইহা সমস্ত রক্তের এক-পঞ্চমাংশ হইতে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সাময়িকভাবে মজুত করিয়া রাখে।

রক্তের কাজ (Functions of blood)

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্ত অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। যেমন—

(1) রক্ত প্রধানতঃ অক্সিহিমোগ্লোবিন-রূপে এবং অংশতঃ রক্তরসে শোষিত অবস্থায়, শ্বাস-যন্ত্র হ ত দেহের অন্যান্য অংশে অক্সিজেন বহন করিয়া নিয়া যায়।

(2) বিভিন্ন যন্ত্রে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রধানতঃ রক্তরসের সোডিয়াম কার্বোনেটের সঙ্গে মিশিয়া সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট-রূপে শ্বাস-যন্ত্রে বাহির হয় এবং সেখানে রক্ত হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড-রূপে বিদূরিত হয়।

(3) পৌষ্টিক নালীর প্রাকার হইতে রক্তরস দ্বারা পাচিত খাদ্য ও জল শোষিত হয় এবং রক্ত-বাহিত হইয়া উহা কোষে কোষে পৌঁছায়।

(4) রেচন-পদার্থ, অতিরিক্ত খনিজ পদার্থ এবং জল রক্ত-বাহিত হইয়া রেচন-যন্ত্রে পৌঁছানোর পর, ঐ যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত হইতে দূরীভূত হয়।

(5) অনাল গ্রন্থি (Ductless glands) হইতে নিঃসৃত হর্মোন রক্তের সাহায্যে উৎপত্তি-স্থল হইতে দূরবর্তী স্থানে নীত হয়।

(6) প্রয়োজনের সময়, কোনও যন্ত্রের সঞ্চিত খাদ্য রক্ত-বাহিত হইয়া অন্যান্য যন্ত্রে পৌঁছায়।

(7) রক্ত দেহের মধ্যে মোটামুটি সুস্থিত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

(8) শ্বেত রক্তকণিকাগুলি কোষের মধ্যে রোগ-জীবাণু গ্রহণ করিয়া এবং প্রতিবিষ নিঃসরণ করিয়া, রোগ-প্রতিরোধে সাহায্য করে।

(9) ক্ষত সৃষ্টি হইলে, রক্ত শীঘ্রই জমাট বাঁধিয়া ক্ষতের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে, রক্ত-ক্ষরণ বন্ধ হয় এবং রোগ-জীবাণু সহজে ক্ষতে প্রবেশ করিতে পারে না।

(10) সমোষ্ণশোণিত প্রাণীদের বিভিন্ন যন্ত্রে, বিশেষ করিয়া পেশী ও যকৃতে,

উৎপন্ন তাপ দেহের পরিধির দিকে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গায় চলিয়া যায়। এইভাবে রক্ত দেহের উষ্ণতার সমতা-রক্ষায় সাহায্য করে।

(11) ব্যাঙাচির শ্বেত রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে লেজের কোষগুলি কোষ-মধ্যে গ্রহণ করিয়া, ব্যাঙাচির রূপান্তরে সাহায্য করে।

রক্তের তঞ্চন (Coagulation of blood)

রক্তবাহর মধ্যের রক্তে **হেপারিন (Heparin)** নামের বস্তু থাকায়, রক্ত জমাট বাঁধে না। কিন্তু কোনও অংশে ক্ষত সৃষ্টি হইলে, শীঘ্রই (সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তিন মিনিটের মধ্যেই) ঐ অঞ্চলে রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায়। ইহাতে রক্তক্ষয় বন্ধ হয়। এই প্রক্রিয়াকে রক্তের **তঞ্চন (Coagulation)** বা **জমাট-বাঁধা (Clotting)** বলে।

রক্তের তঞ্চনে থ্রম্বোসাইট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তঞ্চনের ফলে রক্তরসের **ফাইব্রিনোজেন (Fibrinogen)** নামের প্রোটীন **ফাইব্রিন (Fibrin)**-এ পরিবর্তিত হয়। ফাইব্রিন সূত্র-জালকের আকার ধারণ করে। রক্তকণিকাগুলি রক্ত-জালকের মধ্যে আবদ্ধ হয়। এইভাবে রক্ত জমাট বাঁধে। জমাট-বাঁধার পর রক্তের হাল্কা হলুদ রঙের অবশিষ্ট তরল অংশকে রক্তের **সিরাম (Serum)** বলে। সিরাম, বস্তুতঃপক্ষে, রক্তরস; তবে ইহাতে ফাইব্রিনোজেন থাকে না।

4

চলন ও গমন
(Movement and Locomotion)

কোনও কিছু নড়াচড়া অথবা চলাফেরা করিতে দেখিলে, স্বভাবতঃই উহাকে জীবন্ত বলা হয়। বস্তুতঃপক্ষে, নড়াচড়া করা বা চলাফেরা করা জীবনের অন্যতম ধর্ম। জীবনের এই বিশেষ ধর্মের বিষয়ে বর্তমান পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইল।

প্রয়োজনের তাগিদে, যেমন—খাদ্য অন্বেষণ, প্রতিকূল পরিবেশ ও শত্রু হইতে দূরে যাওয়া এবং জনন ইত্যাদির জন্য জীব নিজের চেষ্টায় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়। উষ্ণতা ও আলোকের হ্রাস-বৃদ্ধি, আঘাত, স্পর্শ, রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শ, এমনকি অভিকর্ষ (Gravity)-এর প্রভাব ইত্যাদি উদ্দীপক (Stimulus)-ও জীব-দেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ইহার ফলে জীব নড়াচড়া করিয়া থাকে। জীবের পক্ষে সামগ্রিকভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়াকে **গমন (Locomotion)**, এবং দেহের অংশ-বিশেষ আন্দোলিত করাকে **চলন (Movements)** বলে। নিচে গমন ও চলনের সংজ্ঞা দেওয়া হইল।

যে প্রক্রিয়ায় জীব নিজের চেষ্টায় সামগ্রিকভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, তাহাকে গমন বলে। যে প্রক্রিয়ায় জীব দেহের অংশ-বিশেষ আন্দোলিত করে তাহাকে চলন বলে।

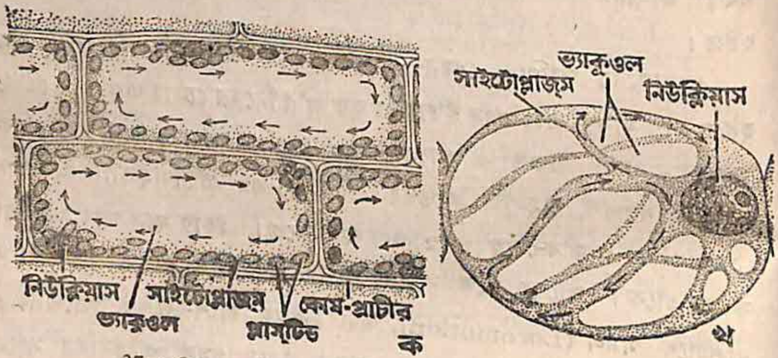
কচুরিপানা, খুদিপানা, বড় পানা ইত্যাদি ভাসমান জলজ উদ্ভিদ এবং জেলি-ফিশ (Jelly-fish) ফাইসেলিয়া (*Physalia*) প্রভৃতি ভাসমান প্রাণী জলের উপরিতলে থাকে এবং স্রোতের টানে ও বায়ু-তাড়িত হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়। এই স্থান-পরিবর্তনকে গমন বলা যাইবে না। কারণ, ইহা জীবের নিজের চেষ্টায় হয় না।

প্রোটোপ্লাজ্‌মের চলন (Movements of protoplasm)

জীবের বৈশিষ্ট্যগুলি কোষেও দেখা যায়। সেইজন্য কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌মেও চলন হয়। এই চলনের ফলে কোষের মধ্যে গ্যাসীয় পদার্থ, খাদ্যের দ্রবণ এবং রেচন-পদার্থ সংবাহিত হইতে পারে। ইহা এককোষী জীবের

গমনেও সাহায্য করে (পরে দ্রষ্টব্য)। প্রোটোপ্লাজ্‌মের চলনকে **আবর্তন (Cyclosis)** বলে। আবর্তন দুই ধরনের। যেমন—

(1) **আবর্ত (Rotation)**—উদ্ভিদের পরিণত কোষের মাঝখানে সাধারণতঃ একটি বড় ভ্যাকুওল থাকে এবং প্রোটোপ্লাজ্‌ম কোষ-প্রাচীরের ধার ঘেঁষিয়া একটি পাতলা স্তরে বিন্যস্ত থাকে। এইরকম কোষে প্রোটোপ্লাজ্‌ম অনবরত একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয় (37 নং চিত্র-ক)। প্রোটোপ্লাজ্‌মের এইধরনের চলনকে **আবর্ত** বলে। অনেকে এই চলনকে **একমুখী আবর্তন**-ও বলিয়া থাকেন। পাতাশেওলা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদের কোষে এইরকম চলন দেখা যায়।



37 নং চিত্র—প্রোটোপ্লাজ্‌মের চলন : ক. আবর্ত ; খ. সংবহন।

(2) **সংবহন (Circulation)**—অপরিণত উদ্ভিদ-কোষে ও প্রাণিকোষে সাধারণতঃ অনেকগুলি ছোট ছোট ভ্যাকুওল থাকে এবং প্রোটোপ্লাজ্‌ম প্রতিটি ভ্যাকুওলের পরিধি-বরাবর নানাদিকে, বিভিন্ন পথে, অনিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয়। প্রোটোপ্লাজ্‌মের এইরকমের চলনকে **সংবহন** বলে। অনেকে ইহাকে **বহুমুখী আবর্তন**-ও বলেন। কুমড়ার কাণ্ডের রোমের কোষে প্রোটোপ্লাজ্‌মের সংবহন হয় (37 নং চিত্র-খ)।

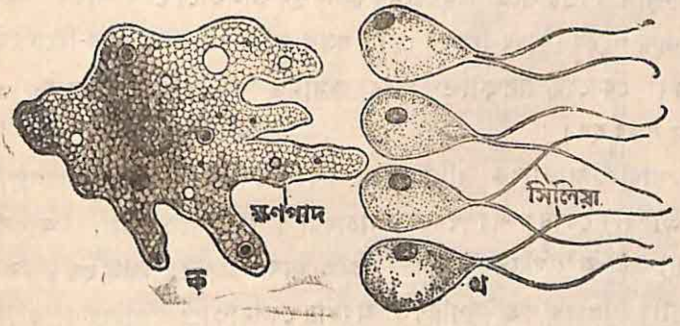
এককোষী জীবের গমন (Locomotion in unicellular organisms)

অধিকাংশ এককোষী জীব স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে অর্থাৎ গমন করিতে পারে। এই গমন প্রধানতঃ দুই ধরনের। যেমন—

(ক) **অ্যামিবয়েড (Amoeboid)**—অ্যামিবা নামক নির্দিষ্ট আকার-বিহীন এককোষী প্রাণী ও মিক্সোমাইসিটিস (Myxomycetes) নামের ছত্রাক

এই পদ্ধতিতে গমন করে। এরূপ গমনের সময় অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলে প্রোটোপ্লাজ্‌ম গতিপথের দিকে সূক্ষ্ম আঙুলের মতো প্রসারিত হয়। এই প্রসারিত অংশকে **ক্ষণপাদ (Pseudopodium)** বলে (38 নং চিত্র-ক)। ক্ষণপাদের বিপরীত দিকের প্রোটোপ্লাজ্‌ম সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষণপাদের মধ্যে প্রবেশ করে। এইভাবে, প্রোটোপ্লাজ্‌মের নিয়মিত সঙ্কোচন ও শ্লথন দ্বারা অ্যামিবা গতিপথের দিকে খুব সামান্য আগাইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এইরকম গমনের দ্রুতি খুবই কম—স্বাভাবিক অবস্থায়, সেকেণ্ডে 0·5 হইতে 5 মাইক্রো পর্যন্ত।

(খ) সিলিয়ারী (Ciliary)—অনেক এককোষী জীবের পরিধিতে সূক্ষ্ম চাবুকের মতো প্রোটোপ্লাজ্‌ম-নির্মিত একটি, দুইটি অথবা অল্প কয়েকটি অভিক্ষেপ থাকে। ইহাদের **সিলিয়া (Cilia)*** বলে। ক্লামাইডোমোনাস (*Chlamydomonas*) নামক এককোষী উদ্ভিদে এবং মস (Moss, 38 নং চিত্র-খ) ও ফার্ণ (Fern)-এর পুং-জনন-কোষে এইরকম গঠন দেখা যায়। ট্রাইপ্যানোসোমা (*Trypanosoma*) নামক এককোষী প্রাণীতে এইরকম একটি-মাত্র অভিক্ষেপ থাকে। ইহাকে **ফ্লাজেলাম (Flagellum)†** বলা হয়।



38 নং চিত্র—এককোষী জীবের গমন: ক. অ্যামিবয়েড; খ. সিলিয়ারী।

আবার, প্যারামিসিয়াম নামক এককোষী প্রাণীর পরিধিতে অসংখ্য ছোট ছোট সিলিয়া নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিন্যস্ত থাকে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, সিলিয়া এবং ফ্লাজেলা গঠনের দিক দিয়া একই। তবে, অপেক্ষাকৃত লম্বা ও মোটা এবং সংখ্যায় অল্প হইলে তাহাদের সাধারণতঃ ফ্লাজেলা, এবং বেঁটে, সরু ও বেশি সংখ্যায় থাকিলে তাহাদের সিলিয়া বলা হয়। জল অথবা অন্য কোনও তরল মাধ্যমে সিলিয়া আন্দোলিত করিয়া এককোষী জীব তাড়াতাড়ি স্থান পরিবর্তন করিতে পারে।

* বহুবচন: সিলিয়াম (Cilium)—একবচন। † একবচন: ফ্লাজেলা (Flagella)—বহুবচন।

উদ্ভিদের চলন (Movement in plants)

অধিকাংশ উন্নতধরনের উদ্ভিদ মাটির সঙ্গে আট্‌কাইয়া থাকায়, গমন করিতে পারে না। ইহারা, অবশ্য, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করিতে পারে। অতএব, ইহাদের ক্ষেত্রে কেবল চলন দেখা যায়। উদ্ভিদের চলনের হার খুবই কম। বিশেষভাবে নিরীক্ষণ না করিলে, ইহা ধরা যায় না। তবে, পুষ্প-মুকুল প্রস্ফুটিত হইয়া পুষ্পে পরিণত হওয়া, আকর্ষের অবলম্বন প্যাচাইয়া ধরা ইত্যাদি সহজেই নজরে পড়ে। এই সমস্ত উদ্ভিদের চলনের জন্যই সম্ভব হয়।

মাটির সঙ্গে আবদ্ধ উদ্ভিদের চলনকে **বক্রচলন (Movements of curvature)** বলা হয়। বক্রচলন প্রধানতঃ দুই ধরনের—(ক) স্বতঃ-বক্রচলন এবং (খ) আবিষ্ট বক্রচলন। নিচে ইহাদের বিষয়ে বলা হইল।

স্বতঃ-বক্রচলন (Spontaneous movements of curvature)

বাহিরের কোনও উদ্দীপকের প্রভাব ছাড়া, উদ্ভিদের নিজস্ব জীবনযাত্রার বহিঃপ্রকাশের ফলে যেসব চলন দেখা যায়, তাহাদের স্বতঃ-বক্রচলন বলা হয়। বন-চণ্ডাল গাছের পত্রে এইধরনের চলন খুব ভালভাবে দেখা যায়। এই গাছের ত্রিফলক পত্রের নিচের দিকের ছোট পত্রক দুইটি অনবরত উপর-নিচে উঠা-নামা করে। কোষের রসস্ফীতি-চাপের ক্রমাগত কম-বেশি হওয়ার জন্য এইরকম চলন সম্ভব হয়।

আবার, স্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে, শিম, অপরাজিতা, তরুলতা ইত্যাদি বল্লী (Twiner) কোনও অবলম্বনকে প্যাচাইয়া উপরের দিকে উঠে। আকর্ষ(Tendril)-এর অবলম্বনকে জড়াইয়া ধরাও আকর্ষের বৃদ্ধির জন্যই হয়। কলা, কচু ইত্যাদি উদ্ভিদের পত্র অপরিণত অবস্থায় বেলনাকারে জড়াইয়া থাকে। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে (অর্থাৎ, পরিণত হইতে থাকিলে) ইহারা ক্রমেই খুলিয়া যায়। পুষ্প-মুকুলের প্রস্ফুটিত হওয়াও বৃদ্ধি-জনিত চলনের ফলে সম্ভব হয়।

আবিষ্ট বক্রচলন (Induced movements of curvature)

উদ্ভিদের অধিকাংশ চলন প্রধানতঃ আলোক, জল, উষ্ণতা, অভিকর্ষ, স্পর্শ ইত্যাদি বাহ্য প্রভাবের উপর নির্ভর করে। এইধরনের বাহ্য প্রভাবকে **উদ্দীপক (Stimulus)** বলে। সাধারণতঃ উদ্দীপকের গতিপথ দ্বারা উদ্ভিদ-অঙ্গের চলনের গতিপথ নির্ধারিত হয়। এইরকম চলনকে **ট্রপিক চলন (Tropic Movements)** বা ট্রপিজ্‌ম (Tropisms) বলা হয়। আবার, অনেক সময় চলনের গতিপথ উদ্দীপকের গতিপথের উপর নির্ভর না করিয়া প্রধানতঃ উহার তীব্রতার

উপর নির্ভর করে। এইরকম চলনকে **ন্যাস্‌টিক চলন** (Nastic movements) বা **ন্যাস্‌টিসিজ্‌ম** (Nasticisms) বলে। নিচে এই দুই ধরনের চলন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

ট্রপিক চলন (Tropic movements)

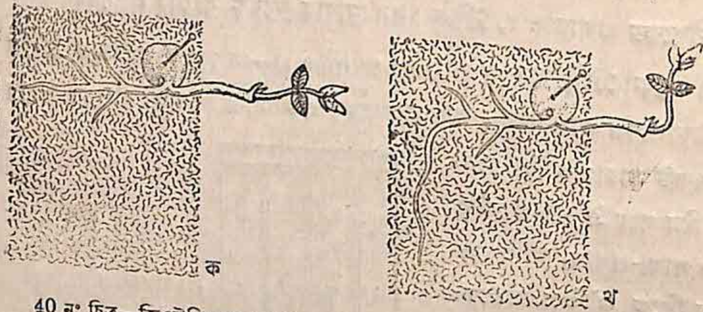
উদ্দীপকের প্রকারভেদে, ট্রপিক চলন আবার কয়েক ধরনের। যেমন—

(1) **ফোটোট্রপিজ্‌ম** (Phototropism)—আলোক এইরকম ট্রপিক চলনে উদ্দীপকের কাজ করে। অন্ধকার ঘরের একটিমাত্র জানালা খুলিয়া, উহার কাছে একটি চারাগাছ রাখিলে, কয়েক দিন পরে ঐ চারাগাছটির কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা জানালার বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া যাইতে দেখা যায়। আলোকের প্রভাবে কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার এই-ধরনের চলনকে **ফোটোট্রপিজ্‌ম** বলে। সূর্যালোকই এই ধরনের চলনে উদ্দীপকের কাজ করে বলিয়া, ফোটোট্রপিজ্‌মকে **সূর্যাবৃত্তি** বা **হেলিওট্রপিজ্‌ম**(Heliotropism)-ও বলা হয়। উদ্ভিদের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা আলোকের গতিপথের দিকে চালিত হয়। এই উদ্ভিদ-অঙ্গগুলিকে **আলোক-অনুকূলবর্তী** (Positively phototropic) বলে। মূল আলোকের গতিপথের বিপরীত দিকে ধাবিত হয়। সেইজন্য, মূলকে **আলোক-প্রতিকূলবর্তী** (Negatively phototropic) বলা হয়। অধিকাংশ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্র আলোকের গতিপথের সঙ্গে সমকোণে থাকে। ইহাদের **ডায়াহেলিওট্রপিক** (Diaheliotropic) বলে।



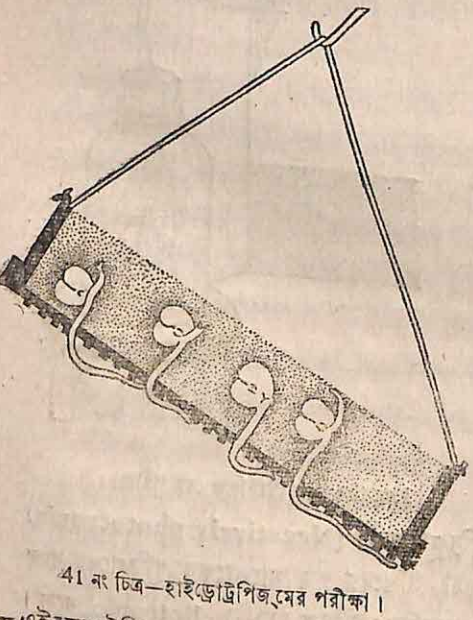
39নং চিত্র—ফোটোট্রপিজ্‌মের পরীক্ষা।

(2) **জিওট্রপিজ্‌ম (Geotropism)**—অভিকর্ষের প্রভাবে উদ্ভিদ-অঙ্গের বক্রচলনকে **জিওট্রপিজ্‌ম** বলে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ অভিকর্ষের প্রভাবে বিভিন্ন দিকে চালিত হয়। প্রধান মূল অভিকর্ষজ বলের গতিপথের দিকে ধাবিত হয় বলিয়া, ইহা **অনুকূল-অভিকর্ষী (Positively geotropic)**। কিন্তু



40 নং চিত্র—জিওট্রপিজ্‌মের পরীক্ষা : ক. প্রাথমিক অবস্থা ; খ. জিওট্রপিজ্‌মের প্রভাবে মূল ও কাণ্ডের দিক পরিবর্তন।

কাণ্ড অভিকর্ষের বিপরীত দিকে বর্ধিত হয়। সেইজন্য, ইহাকে **প্রতিকূল-অভিকর্ষী (Negatively geotropic)** বলে। এক টুকরা ছিপির পাতকে ভিজা ব্লটিং কাগজ দিয়া মুড়িয়া উহার মাঝখানে (বীজপত্রসহ) মটরগাছের একটি ছোট চারা আল্‌পিনের সাহায্যে অনুভূমিকভাবে গাঁথিয়া পাতটিকে খাড়াভাবে রাখিয়া দিলে (40 নং চিত্র-ক), কাণ্ডটি বাঁকিয়া উপরের দিকে এবং মূল বাঁকিয়া নিচের দিকে বাড়িতে দেখা যায় (40 নং চিত্র-খ)। উদ্ভিদের পত্র ও শাখামূল অভিকর্ষজ বলের গতিপথের সঙ্গে সমকোণে বর্ধিত হয়।



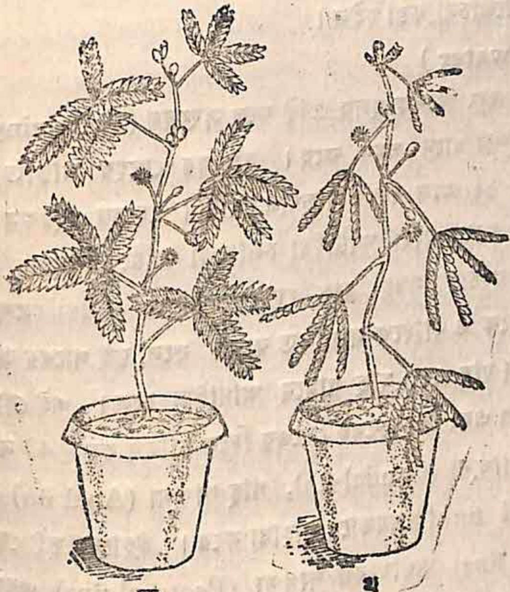
41 নং চিত্র—হাইড্রোট্রপিজ্‌মের পরীক্ষা।

(3) **হাইড্রোট্রপিজ্‌ম(Hydrotropism)**—এইরকম ট্রপিক চলনে জল উদ্দীপকের কাজ করে। মূল জল-অনুকূলবর্তী

(Positively hydrotropic) ; অর্থাৎ, ইহা জলের দিকে ধাবিত হয়। কাণ্ড সাধারণতঃ জল-প্রতিকূলবর্তী (Negatively hydrotropic)। ইহা জলের বিপরীত দিকে বর্ধিত হয়। একটি চালুনির মধ্যে কিছু ভিজা কাঠের গুঁড়া রাখিয়া, উহাতে কয়েকটি ছোলা বপন করিয়া, চালুনিটিকে হেলানো অবস্থায় কিছুদিন ঝুলাইয়া রাখিলে দেখা যায় যে, অঙ্কুরিত ছোলার মূল চালুনির ছিদ্রের মধ্য দিয়া সোজা বাহির হইয়া আসিয়াছে। ঐ অবস্থায় আরও কয়েকদিন রাখিলে, মূলগুলিকে চালুনির দিকে বাঁকিয়া উহার ছিদ্রের মধ্য দিয়া আবার কাঠের গুঁড়ার ভিতর প্রবেশ করিতে দেখা যায় (41 নং চিত্র)। অভিকর্ষজ বলের প্রভাবে মূল প্রথমে চালুনির ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসে। কিন্তু চালুনির বাহিরে জল না থাকায়, উহারা আবার চালুনির মধ্যস্থ ভিজা কাঠের গুঁড়ার (জলের) ভিতর প্রবেশ করে।

ন্যাস্টিক চলন (Nastic movements)

লজ্জাবতী লতার পত্র স্পর্শ করিলে সঙ্গে সঙ্গে মুড়িয়া যায় (42 নং চিত্র-খ)। ইহা ন্যাস্টিক চলনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে স্পর্শ উদ্দীপকের কাজ করে।



42 নং চিত্র—লজ্জাবতীলতার পত্রের ন্যাস্টিক চলন : ক. স্পর্শের আগে ; খ. স্পর্শের পরে।

আলোক-রূপ উদ্দীপকের তীব্রতার উপর অনেক পুষ্পের প্রস্ফুটিত হওয়া নির্ভর করে। যেমন—দুপুরে-ফুল দুপুরবেলার তীব্র আলোকে প্রস্ফুটিত হয়। আবার,

শালুক, কৃষ্ণকলি ইত্যাদি পুষ্প বিকালের মৃদু আলোকে প্রস্ফুটিত হয়। অনেক সময় দুইটি উদ্দীপকের সম্মিলিত প্রভাবেও ন্যাস্টিক চলন দেখা যায়। কপাটি গাছের পত্র দিনের বেশি উষ্ণতা ও তীব্র আলোকে খুলিয়া যায়, কিন্তু সন্ধ্যার মৃদু আলোক এবং অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতায় মুড়িয়া যায়। এক্ষেত্রে আলোক এবং উষ্ণতা দুই-ই উদ্দীপকের কাজ করে।

প্রাণীদের চলন ও গমন (Movement and locomotion in animals)

উদ্ভিদের তুলনায় প্রাণীদের চলন খুব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কেবল তাহাই নয়, অল্প কিছু-সংখ্যক প্রাণী ছাড়া, সব প্রাণী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে পারে। স্পঞ্জ, সাগর-কুসুম (Sea anemones), অ্যাসিডিয়া (*Ascidia*) প্রভৃতি কয়েক ধরনের প্রাণী পরিণত অবস্থায় কোনও কিছুর সঙ্গে আটকাইয়া থাকে। ঐ সময়ে ইহারা গমন করিতে পারে না।

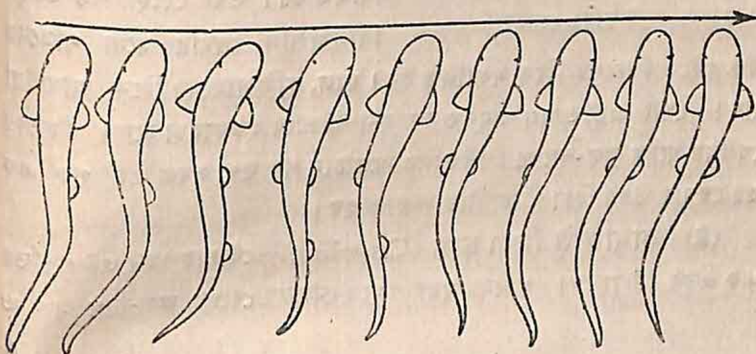
প্রাণীদের গমনের পদ্ধতি (Methods of locomotion in animals)

বিভিন্ন প্রাণী জলে, স্থলে, বৃক্ষে এবং বায়ুতে নানাভাবে গমন করে। এই বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হইল।

জলে (In water)

জলজ প্রাণী এবং অনেক স্থলজ প্রাণী জলে **সন্তরণ (Swimming)** করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে। মাছদের দেহের আকৃতি কতকটা পটোলের মতো—দুই প্রান্ত সরু ও মাঝখান মোটা। দেহের এইরকম আকৃতির জন্য ইহারা সহজে জলের বাধা কাটাইয়া চলাফেরা করিতে পারে। সন্তরণের অর্থাৎ সাঁতার কাটার সময় মাছ দেহকে, বিশেষ করিয়া লেজ-অংশকে, পর্যায়ক্রমে ডানদিকে ও বাঁদিকে সঞ্চালিত করে। ফলে, দুই পাশের জল মাছের পিছনদিকে চলিয়া যায় এবং মাছ সামনে আগাইয়া চলে। এই দেহ-সঞ্চালন শুরু হয় দেহকাণ্ডে এবং উহা ক্রমেই লেজের দিকে চালিত হয় (43 নং চিত্র)। অগ্র-গমনে পুচ্ছ-পাখ্‌না (Caudal-fin), পায়ু-পাখ্‌না (Anal fin) এবং পৃষ্ঠ-পাখ্‌না (Dorsal fin) বিশেষভাবে সাহায্য করে। ইহাদের দুই জোড়া যুগ্ম-পাখ্‌না (Paired fins) অর্থাৎ বক্ষ-পাখ্‌না (Pectoral fins) এবং শ্রোণী-পাখ্‌না (Pelvic fins) মাছকে জলের মধ্যে উঠা-নামা, কোনও নির্দিষ্ট গভীরতায় চলা অথবা কোনও স্থানে স্থির হইয়া ভাসিয়া থাকিতে সাহায্য করে। অনেক মাছের দেহের মধ্যে পট্‌কা (Air bladder) নামের বায়ুপূর্ণ এক থলি থাকে।

পট্‌কাণ্ড সন্তরণে সাহায্য করে। জোঁক এবং জলজ চ্যাপ্টা কৃমির দেহ উপর-নিচে চাপা। সেইজন্য, ইহারা দেহকে পর্যায়ক্রমে উপর-নিচে বাঁকাইয়া সাঁতার কাটে। তিমির দেহ-ও মাছের মতো। ইহাদের অগ্র-পদের আঙ্‌ুলগুলি পরস্পর জুড়িয়া গিয়া অগ্র-পদ দুইটি দাঁড়ের মতো আকার ধারণ করে। তিমি ইহাদের সাহায্যে সাঁতার কাটে। ইহাদের অনুভূমিক 'পুচ্ছ-পাখ্‌না' উপর-নিচে উঠা-নামা



43 নং চিত্র—হাঙরমাছের সন্তরণের সময় দেহকাণ্ড ও লেজের আপেক্ষিক অবস্থান।

করিয়া সন্তরণে সাহায্য করে। সীল(Seal)-দের অগ্র-পদ দুইটি বড় দাঁড়ের মতো এবং পশ্চাৎ-পদ দুইটি পরস্পর জুড়িয়া গিয়া 'পুচ্ছ-পাখ্‌না'র মতো আকার ধারণ করে (44 নং চিত্র)। কোলা ব্যাঙের পশ্চাৎ-পদ এবং হাঁস প্রভৃতি



44 নং চিত্র—সীলের সন্তরণ-উপযোগী দেহ।

জলচর পাখিদের পদের আঙ্‌ুলগুলি পরস্পর পাতলা চামড়া দিয়া যুক্ত থাকে। এই ধরনের পদকে লিপ্তপাদ (Webbed feet) বলা হয়। লিপ্তপাদের সাহায্যে ইহারা জল পিছনদিকে ঠেলিয়া দিয়া সামনের দিকে দ্রুত আগাইয়া চলে।

স্থলে (On land)

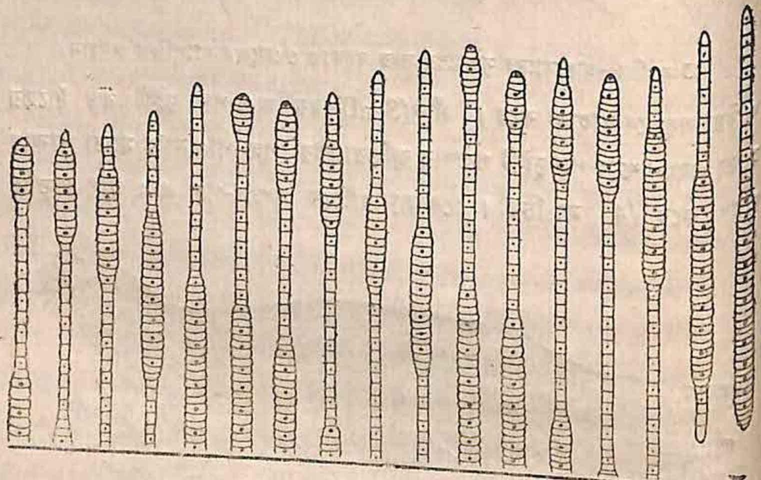
নানাধরনের স্থলচর প্রাণী স্থলের কঠিন তলের উপরে নানা পদ্ধতিতে ধীরে অথবা দ্রুত গমন করিতে পারে। যেমন—

(1) **হড়কাইয়া চলা (Gliding)**—স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বসবাসকারী চ্যাপ্টা কৃমি এই পদ্ধতিতে গমন করে। হড়কাইয়া চলার সময়, এই কৃমি দেহের অগ্র-ভাগ মাটির উপরিতল হইতে অল্প উপরে রাখে ; এবং দেহের অঙ্ক-তলে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা (Mucus) নিঃসৃত হয়। তখন দেহের অঙ্ক-তলের সিলিয়াগুলি শ্লেষ্মার মধ্যে সামনের দিক হইতে পিছনের দিকে সঞ্চালিত হয়। ফলে, কৃমি সামনের দিকে আগাইয়া যায়। গেঁড়ি প্রভৃতি স্থল-শামুকও কতকটা এইভাবে হড়কাইয়া চলে। ইহাদের পেশীময় পদের অঙ্ক-ভাগের পেশীগুলির সঙ্কোচনে পদ তথা সমগ্র প্রাণী পুরু এক স্তর শ্লেষ্মার উপর দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়।



45 নং চিত্র—চ্যাপ্টা কৃমির হড়কাইয়া চলা।

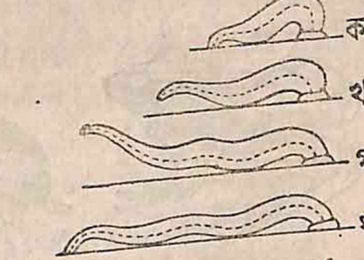
(2) **হামাগুড়ি দিয়া চলা (Crawling)**—কেঁচোর গমন এই পদ্ধতির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গমনের সময় প্রথমে কেঁচোর দেহের অগ্র-ভাগ সরু ও


46 নং চিত্র—কেঁচোর হামাগুড়ি দিয়া চলা।

লম্বা হইয়া সামনের দিকে কিছুটা আগাইয়া যায় (46 নং চিত্র)। দেহের এই অঞ্চলের উপরিতলে অবস্থিত সূক্ষ্ম ও অল্প বাঁকা কাঁটার মতো সিটা(Setae)-গুলি তখন মাটির সঙ্গে আট্‌কাইয়া যায়। ইহার পর একাদিক্রমে দেহের মাঝের অংশ ও শেষের অংশ একইভাবে সামনের দিকে আগাইয়া যায় এবং সিটার সাহায্যে মাটির সঙ্গে আট্‌কাইয়া যায়। তখন আবার দেহের অগ্র-ভাগ মোটা ও বেঁটে হইয়া যায়। ফলে, দেহের পরবর্তী (অর্থাৎ মাঝের) অংশে টান পড়ে বলিয়া, ঐ

অংশ সামনের দিকে সরিয়া যায়। দেহের মাঝের অংশ মোটা হইয়া, তেমনি-ভাবে, দেহের শেষ-অংশকে টানিয়া সামনের দিকে নিয়া যায়। এইভাবে, দেহকে পর্যায়ক্রমে সরু ও লম্বা এবং বেঁটে ও মোটা করিয়া, এবং সিটার সাহায্যে কেঁচো ধীরে ধীরে গমন করে। এই পদ্ধতিতে গমনের সময় দেহের অঙ্ক-তল মাটির সঙ্গে লাগিয়া থাকে। স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বসবাসকারী চ্যাপ্টা কৃমিরাও অনেক সময়ে এই পদ্ধতিতে গমন করে। সাপ ও টিকটিকির গমন-পদ্ধতিকেও হামাগুড়ি দিয়া চলা বলা যায়। কারণ, গমনের সময় ইহাদের অঙ্ক-তল মাটির সঙ্গে লাগিয়া থাকে।

(3) লূপিং (Looping)—শুঁয়াপোকা অর্থাৎ মথ ও প্রজাপতির শূক (Larva), ছিনে-জোঁক, জোঁক সচরাচর যে পদ্ধতিতে গমন করে, তাহাকে লূপিং বলে। জোঁক জলে সাঁতার কাটিলেও, জলের নিচের মাটির উপর এই পদ্ধতিতে গমন করে। জোঁকের দেহের দুই প্রান্তে দুইটি চোষক থাকে। এই পদ্ধতিতে গমনের সময় জোঁক প্রথমে পশ্চাৎ-চোষক (Posterior sucker) মাটির সঙ্গে আট্‌কাইয়া দেয় (47নং চিত্র-ক)। চোষক হইতে নিঃসৃত চট্‌চটে আঠালো রস চোষককে মাটির সঙ্গে আট্‌কাইয়া থাকিতে সাহায্য করে। ইহার পর জোঁক দেহকে সরু ও লম্বা করিয়া সামনের দিকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করে (47 নং চিত্র-খ ও গ) এবং অগ্র-চোষককে মাটির সঙ্গে আট্‌কাইয়া দেয় (47 নং চিত্র-ঘ)। তাহার পর জোঁক পশ্চাৎ-চোষক মাটি হইতে তুলিয়া নেয় (47 নং চিত্র-ঙ) এবং দেহকে বেঁটে ও মোটা করিয়া অগ্র-চোষকের দিকে টানিতে শুরু করে (47 নং চিত্র-চ ও ছ)। এইভাবে পশ্চাৎ-চোষক অগ্র-চোষকের কাছে পৌছিলে, তখন জোঁক পশ্চাৎ-চোষককে



47 নং চিত্র—জোঁকের লূপিং পদ্ধতিতে গমন।

অগ্র-চোষকের ঠিক পিছনে আট্‌কাইয়া দেয়। ইহাতে জোঁকের দেহ ইংরেজী উল্টা ইউ (U) অক্ষরের মতো হইয়া যায় (47 নং চিত্র-জ)। পশ্চাৎ-চোষক মাটির সঙ্গে আট্‌কাইয়া যাওয়ার পরই, জোঁক আবার অগ্র-চোষক মাটি হইতে তুলিয়া নেয় এবং আগের মতো দেহকে সামনের দিকে প্রসারিত করে। এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি দ্বারা জোঁক ধীরে ধীরে গমন করে।

(4) **লাফাইয়া চলা (Hopping)**—ফড়িং, উচ্চিংড়ে, ব্যাঙ, খরগোস, ক্যাঙারু (Kangaroo) প্রভৃতি প্রাণীদের পশ্চাৎ-পদ অগ্র-পদের চেয়ে অনেক বেশি লম্বা, পেশীবহুল এবং বেশি শক্তিশালী। লাফানোর সময় ইহারা অগ্র-

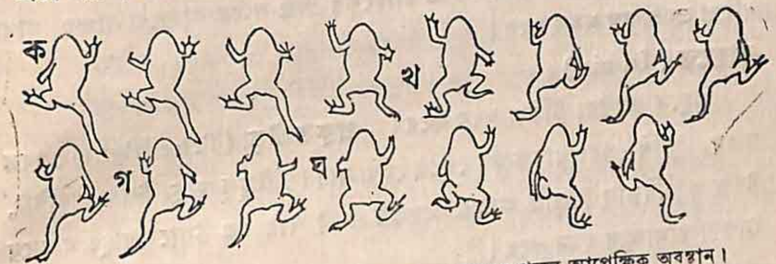


48 নং চিত্র—ক. কোলা ব্যাঙ; খ. খরগোস ও গ. ক্যাঙারুর লাফানোর উপযোগী পশ্চাৎ-পদ।

পদ দুইটিকে সাময়িকভাবে মাটি হইতে তুলিয়া নেয় এবং একই সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি ভাঁজ-করা পশ্চাৎ-পদ দুইটি সোজা করিয়া দেয়। পশ্চাৎ-পদের জোর ঠেলায় দেহ সম্পূর্ণরূপে এবং সাময়িকভাবে ভূমি ত্যাগ করিয়া তীব্রবেগে সামনে আগাইয়া যায়। অভিকর্ষজ বলের প্রভাবে, দেহ অগ্র-পদের উপর ভর দিয়া ভূমি স্পর্শ করে এবং পরে পশ্চাৎ-পদও ভূমি স্পর্শ করিয়া দেহের অক্ষ-তলে 'Z' অক্ষরের মতো ভাঁজ হইয়া যায়। এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তির ফলে এই সমস্ত প্রাণী তীব্রবেগে গমন করিতে পারে।

(5) **হাঁটিয়া চলা (Walking)**—প্রায় সব চতুষ্পদ প্রাণী এবং অনেক পাখি ও মানুষ—এই দুই ধরনের দ্বিপদ প্রাণী স্থলে সচরাচর হাঁটিয়া গমন করে। চতুষ্পদ প্রাণী হাঁটার সময় কোনও দিকের (যেমন, বাঁদিকের) অগ্র-পদ মাটি হইতে সামান্য উপরে তুলিয়া নেয় এবং পিছনের দিকে অল্প ভাঁজ করিয়া সামনের দিকে আগাইয়া দিয়া মাটিতে স্থাপন করে। অগ্র-পদ মাটিতে স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিকের (অর্থাৎ ডানদিকের) পশ্চাৎ-পদ মাটি হইতে উঠিয়া

যায় এবং সামনের দিকে অল্প ভাঁজ হইয়া, ঐদিকে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর, মাটিতে স্থাপিত হয়। পরের বারে ইহার বিপরীত ক্রিয়া ঘটিতে থাকে; অর্থাৎ, প্রথমে ডানদিকের অগ্র-পদ এবং পরে বাঁদিকের পশ্চাৎ-পদ একইভাবে মাটি হইতে উঠিয়া সামনের দিকে আগাইয়া গিয়া মাটিতে স্থাপিত হয়। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দ্বারা এইসব প্রাণী গমন করে। হাঁটার সময় দেহের অঙ্ক-তল মাটির উপরিতল হইতে উপরে থাকে, এবং একটি পদ সাময়িকভাবে ভূমি হইতে উপরে থাকে। লাফাইয়া চলার সময় ছাড়া, কুনো ব্যাঙ স্থলে অনেক সময় মোটামুটি-ভাবে এই পদ্ধতিতে গমন করে (49 নং চিত্র)।



49 নং চিত্র—ক. হইতে ঘ. গমনের সময় কুনো ব্যাঙের পদের আপেক্ষিক অবস্থান।

দ্বিপদ প্রাণীর গমনের সময় পর্যায়ক্রমে বাঁদিকের ও ডানদিকের পদ মাটি হইতে উঠিয়া, পিছনদিকে অল্প ভাঁজ হইয়া সামনের দিকে আগাইয়া মাটিতে স্থাপিত হয়। নানাধরনের পতঙ্গ এবং কেন্নো প্রভৃতি প্রাণীও যে পদ্ধতিতে গমন করে, তাহাকে হাঁটিয়া চলা বলা যায়।

(6) **দৌড়াইয়া চলা (Running)**—নানাধরনের তৃণভোজী ও মাংসাশী চতুষ্পদ প্রাণী এবং দ্বিপদ প্রাণী জরুরী প্রয়োজনে এই পদ্ধতিতে তীব্রবেগে গমন করিয়া থাকে। গমনের এই পদ্ধতি, বস্তুতঃপক্ষে, হাঁটিয়া চলা এবং লাফাইয়া চলার সংমিশ্রণ। জোরে দৌড়াইয়া চলার সময় দেহ সাময়িকভাবে, সম্পূর্ণরূপে মাটির উপরে উঠিয়া যায়। শিকারী চিতা, ঘোড়া, হরিণ ইত্যাদি প্রাণী খুব জোরে দৌড়াইতে পারে।

বৃক্ষে (On trees)

গিরগিটি, তক্ষক, কাঠঠোকরা, বানর, চিতাবাঘ, কাঠবিড়াল প্রভৃতি প্রাণী বৃক্ষে **আরোহণ করা**(Climbing)-য় পটু। বৃক্ষে আরোহণকারী প্রাণীদের অগ্র-পদ খুব শক্তিশালী, এবং শক্ত, বাঁকা ও ধারালো নখর-যুক্ত হয়। বৃক্ষের অনুভূমিক শাখা-প্রশাখার উপর স্বচ্ছন্দে চলাফেরার জন্য দেহের ভারসাম্য রক্ষা

করা বিশেষ প্রয়োজন। এবিষয়ে লেজ বিশেষ সাহায্য করে। ক্যামেলিয়ন (*Chamaeleon*) নামক গিরগিটি-জাতীয় প্রাণী এবং দক্ষিণ আমেরিকার বানর লেজ শাখা-প্রশাখাকে জড়াইয়া ধরিতে পারে। ইহা ছাড়া, এই প্রাণীদের অগ্র-পদ ও পশ্চাৎ-পদ উভয়ই বৃক্ষের শাখা আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকার শ্লথ (Sloth) নামক প্রাণী সম্পূর্ণরূপে বৃক্ষবাসী। ইহারা বড় বড় ও বাঁকা নখর-যুক্ত দুই জোড়া পদের সাহায্যে উপরের দিকে মুখ করিয়া বৃক্ষের শাখার নিচের দিকে ঝুলিয়া থাকে এবং ঐভাবে খুব ধীরে ধীরে গমন করিয়া থাকে।

উল্লুক সচরাচর বৃক্ষের অনুভূমিক শাখা হইতে লম্বা অগ্র-পদের সাহায্যে ঝুলিয়া এবং পর্যায়ক্রমে ডানদিক ও বাঁদিকের অগ্র-পদের সাহায্যে বৃক্ষের শাখা ধরিয়া দ্রুতবেগে গমন করে।

বায়ুতে (In air)

বায়ুতে প্রাণীরা উড়িয়া গমন করে। **প্রকৃত উড়া (True flight)** কেবল পতঙ্গ, পাখি এবং বাদুড়দের ক্ষেত্রে দেখা যায়। উড়ুক্কু মাছ, উড়ন্ত গিরগিটি, উড়ন্ত কাঠবিড়াল প্রভৃতি আরও কয়েকটি প্রাণী আর এক উপায়ে বায়ুর মাধ্যমে উড়িয়া স্থানান্তরে গমন করে।

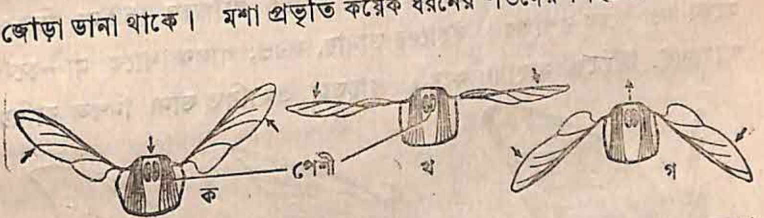
উড়ুক্কু মাছের বক্ষ-পাখ্‌না দুইটি আকারে খুব বড়। উড়িবার সময় ইহারা প্রথমে লাফ দিয়া জল হইতে উপরে (বায়ুতে) উঠিয়া আসে এবং বক্ষ-পাখ্‌না দুইটি বিস্তার করিয়া দেয়। ইহাতে এই প্রাণী সাময়িকভাবে বায়ুর মধ্য দিয়া ভাসিয়া, সামনের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইতে পারে। অভিকর্ষজ বলের প্রভাবে ইহা, অবশ্য, শীঘ্রই আবার জলের মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়। উড়ন্ত গিরগিটির দেহকাণ্ডের দুই পাশে দুইটি অর্ধচন্দ্রাকার পর্দার মতো অংশ থাকে। এই পর্দা দুইটি ইহাকে বায়ুতে ভাসিয়া থাকিতে সাহায্য করে। উড়ন্ত গিরগিটি কোনও উঁচু বৃক্ষের শাখা হইতে জোরে লাফ দিয়া পড়ে। এই সময় ইহাদের পর্দা দুইটি প্রসারিত হইয়া যায়। ফলে, এই প্রাণী বায়ুর মধ্যে কিছুদূর ভাসিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হয়।

উড়ন্ত কাঠবিড়ালেরও দেহের দুই পাশে দুইটি চওড়া পর্দা থাকে। ইহাকে প্যাটাজিয়াম (Patagium) বলে। এই প্রাণী বৃক্ষের কোনও উঁচু শাখা হইতে জোরে লাফ দেয়। এই সময়ে প্যাটাজিয়াম সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত হইয়া যায় এবং উড়ন্ত কাঠবিড়াল বায়ুর মধ্য দিয়া সামনের দিকে কিছুদূর ভাসিয়া যায়। কিন্তু শীঘ্রই অন্য বৃক্ষের নিচুর দিকে অবস্থিত কোনও শাখার উপরে নামিয়া আসিতে বাধ্য হয়।

উপরে বর্ণিত উড়িবার পদ্ধতিতে উড়ন্ত প্রাণী দিক পরিবর্তন করিতে, গতি-বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে অথবা অনুভূমিক তলে চলিতে পারে না, কিংবা একবার উড়িয়া বেশি দূর যাইতে পারে না। সেইজন্য, এইধরনের উড়িবার পদ্ধতিকে **নিষ্ক্রিয়ভাবে উড়া** বা গ্লাইডিং (**Gliding**) বলা হয়।

প্রকৃত উড়াকে **সক্রিয়ভাবে উড়া(Active flight)**-ও বলা যায়। কারণ এই পদ্ধতিতে উড়িবার সময় প্রাণী প্রয়োজনমতো গতিবেগ ও দিক পরিবর্তন করিতে পারে, অনুভূমিক তলে এবং একাদিক্রমে অনেক দূর পর্যন্ত যাইতে পারে। সক্রিয়ভাবে উড়িবার সময় দেহের অগ্র-ভাগের দুই পাশে অবস্থিত একজোড়া (অধিকাংশ পতঙ্গের দুই জোড়া) **ডানা (Wings) উড়ার যন্ত্র(Organs of flight)**-এর কাজ করে। ডানার সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য পেশীর সঙ্কোচনে ডানা উপর-নিচে সঞ্চালিত হয়। ফলে, প্রাণী সামনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

ডানা-যুক্ত অধিকাংশ পতঙ্গের বক্ষের দুই পাশে সামনে-পিছনে অবস্থিত দুই জোড়া ডানা থাকে। মশা প্রভৃতি কয়েক ধরনের পতঙ্গের পিছনের ডানা দুইটি



50 নং চিত্র—ক. হইতে গ. উড়ার সময় পতঙ্গের ডানার আপেক্ষিক অবস্থান (বক্ষের প্রস্থচ্ছেদে)।

ক্ষয়প্রাপ্ত। ইহারা উড়িবার সময় দেহের ভারসাম্য-রক্ষায় সাহায্য করে। পতঙ্গের ডানা দেহের ত্বক্ প্রসারিত হইয়া সৃষ্টি হয় (52 নং চিত্র-ক)। 50 নং চিত্রে উড়িবার সময় পতঙ্গের ডানা-সঞ্চালনের পদ্ধতি দেখানো হইয়াছে।

পাখিরা উড়ায় সবচেয়ে পটু। ইহাদের হাল্কা ও পটোলের মতো আকৃতি-যুক্ত দেহ বায়ুতে ভাসিয়া থাকার পক্ষে উপযোগী। পাখিদের ডানা, প্রকৃতপক্ষে, অগ্র-পদের রূপান্তর। পাখির ডানা পালকাবৃত। ডানার সঙ্গে যুক্ত তিনটি প্রধান পেশীসহ প্রায় পঞ্চাশটি ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের পেশী পাখির ডানা-সঞ্চালনে সাহায্য করে। পাখিদের পুচ্ছ-পালকগুলিও উড়িবার সময় গতিপথ পরিবর্তন করিতে সাহায্য করে।

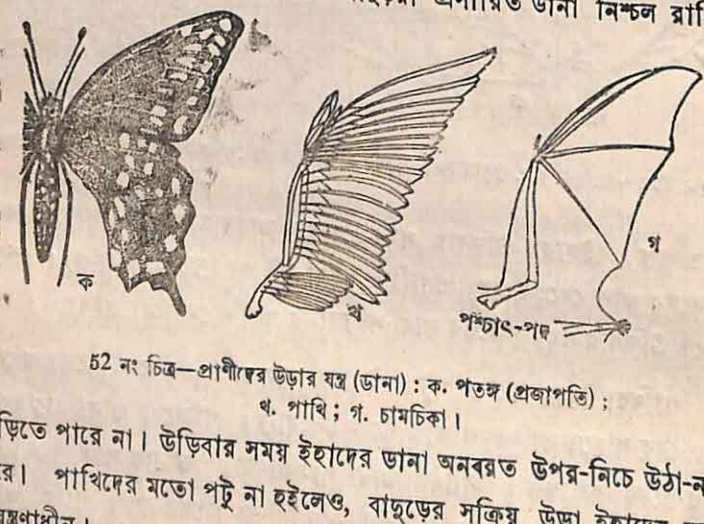
বিভিন্ন ধরনের পাখি নানারকম পদ্ধতিতে উড়িয়া থাকে। পাখিরা সচরাচর

ডানা ঝাপ্টাইয়া উড়ে। এই পদ্ধতিতে উড়ার সময়, পাখি ডানা দুইটিকে সম্পূর্ণ-ভাবে প্রসারিত করিয়া পিছনের দিকে এবং নিচের দিকে জোরে নামাইয়া দেয়। ইহার পর ডানা দুইটি অল্প ভাঁজ করিয়া উপরের দিকে তুলিয়া নেয়। এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি দ্বারা পাখি সামনের দিকে আগাইয়া চলে। শকুন প্রভৃতি কয়েক ধরনের পাখি এই **উত্তপ্ত** বায়ুস্তম্ভের উপরে ডানা প্রসারিত করিয়া বৃত্তাকারে ভাসিয়া বেড়ায়। সমুদ্রচর পাখি অ্যাল্বাট্রস (Albatross) সমুদ্রের উপরের বায়ুতে কতকটা এইভাবে উপর-নিচে আঁকিয়া-বাঁকিয়া ভাসিয়া বেড়ায়।



51 নং চিত্র—পাখির উড়ার সময় ডানার অবস্থান।

বাদুড় ও চামচিকা(52 নং চিত্র-গ)-র ডানাও পাখিদের (52 নং চিত্র-খ) মতো অগ্র-পদের রূপান্তর। ইহাদের ডানায়, অবশ্য, পালক থাকে না—চর্মের আবরণই উড়িতে সাহায্য করে। বাদুড়রা প্রসারিত ডানা নিশ্চল রাখিয়া উড়িতে পারে না। উড়িবার সময় ইহাদের ডানা অনবরত উপর-নিচে উঠা-নামা করে। পাখিদের মতো পটু না হইলেও, বাদুড়ের সক্রিয় উড়া ইহাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন।



52 নং চিত্র—প্রাণীদের উড়ার যন্ত্র (ডানা) : ক. পতঙ্গ (প্রজাপতি) ; খ. পাখি ; গ. চামচিকা।

মানুষের গমন (Locomotion in man)

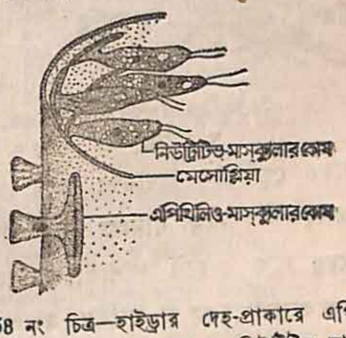
মানুষ জলে সাঁতার কাটিয়া এবং স্থলে হাঁটিয়া ও দৌড়াইয়া গমন করিতে পারে। বৃক্ষারোহণেও মানুষ অপটু নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় না হইলেও,

প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ হামাগুড়ি দিয়া বা বুকে হাঁটিয়া গমন করিতে পারে। মানুষ, অবশ্য, উড়িতে পারে না।

গমনের সঙ্গে যুক্ত গঠনাদি (Structures concerned with locomotion)

গমনের সঙ্গে যুক্ত গঠনাদির চলনের ফলে গমন সম্পন্ন হয়। গমনে সক্ষম অধিকাংশ প্রাণীর দেহের পেশী অথবা উহার অনুরূপ কোনও গঠন থাকে। পেশীর সঙ্কোচনে দেহের অংশাদি সঞ্চালিত হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, পেশীর সঙ্কোচনেই চলন সম্ভব। পেশী প্রসারিত হইতে পারে না। সঙ্কোচনের বিপরীত ক্রিয়াকে শ্লথন (Relaxation) বলা হয়। পেশীর শ্লথনে চলন হয় না। কোনও পেশীর সঙ্কোচনে যদি কোনও অংশ উপরে উঠিয়া যায়, তবে ঐ অংশকে নিচে নামানোর জন্য বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল আর একটি পেশীর সঙ্কোচন প্রয়োজন হয়।

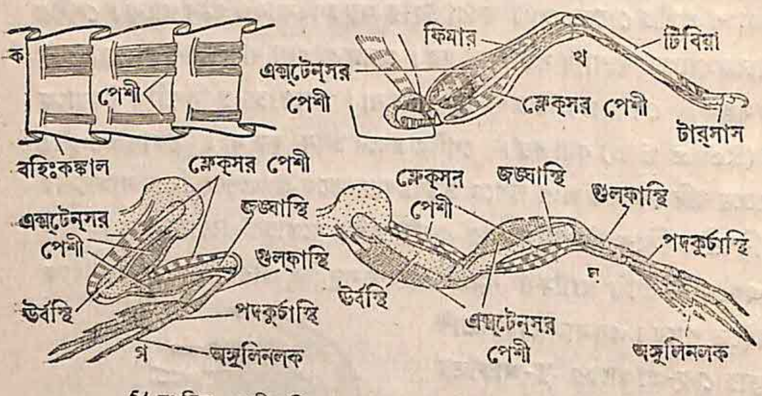
এককোষী প্রাণী অ্যামিবা সমগ্র দেহকে সঙ্কুচিত করিয়া যে-কোনও দিকে বাঁকাইতে পারে। একনালীদেহী প্রাণী হাইড্রার দেহ-প্রাকারের T-আকৃতির এপিথিলিও-মাস্‌ক্যুলার কোষ(Epitheliomuscular cells)-এর প্রসারিত অংশ দেহের অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ-বরাবর বিন্যস্ত থাকে (53 নং চিত্র)। আবার, নিউট্রিটিভ মাস্‌ক্যুলার কোষগুলি (Nutritive muscular cells)-র ঐরকম প্রসারিত অংশ দেহের অনুদৈর্ঘ্য অক্ষের সঙ্গে সমকোণে থাকে। প্রথম ধরনের কোষগুলির সঙ্কোচনে হাইড্রা দৈর্ঘ্যে কমিয়া যায় এবং মোটা হইয়া যায়। দ্বিতীয় ধরনের কোষের সঙ্কোচনে দেহ তেমনি লম্বা ও সরু হইয়া যায়। চ্যাপ্টা কৃমিদের দেহের পেশীগুলি অনুদৈর্ঘ্য, অনুপ্রস্থ এবং পৃষ্ঠ-অঙ্কীয়—এই তিনটি তলে বিন্যস্ত থাকে। কোনও একটি তলের পেশীর সঙ্কোচনে ইহাদের দেহ অন্যান্য তলের দিকে বাঁকিয়া যায়। কেঁচোর দেহে দুইটি পেশীর স্তর থাকে—বাহিরের দিকে অনুদৈর্ঘ্য এবং ভিতরের দিকে (অনুপ্রস্থ) বৃত্তাকার পেশীর স্তর। অনুদৈর্ঘ্য পেশীর সঙ্কোচনে কেঁচোর দেহ দৈর্ঘ্যে কমিয়া যায়, বৃত্তাকার পেশীর সঙ্কোচনে দেহ লম্বা হইয়া যায়। পতঙ্গ ও অন্যান্য সন্ধিপদী প্রাণীর দেহে নানা আকৃতির অনেকগুলি পেশী নানাভাবে সজ্জিত থাকে। ইহাদের পেশী বহিঃকঙ্কাল(Exoskeleton)-এর ভিতরের তলে



58 নং চিত্র—হাইড্রার দেহ-প্রাকারে এপিথিলিও-মাস্‌ক্যুলার কোষ ও নিউট্রিটিভ মাস্‌ক্যুলার কোষের প্রসারিত অংশের সজ্জারীতি।

যুক্ত থাকে। পেশীর সঙ্কোচনে দেহ-খণ্ডকগুলি এবং সন্ধিল উপাঙ্গ(Jointed appendages)-এর খণ্ডগুলি নড়াচড়া করিতে পারে (54 নং চিত্র-ক ও খ)।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পেশীগুলি রেখাঙ্কিত (Striated)। ইহারা অন্তঃকঙ্কালের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সেইজন্য, ইহাদের অস্থি-সংলগ্ন পেশী (Skeletal muscles)-ও বলে। মাছ এবং মাছের মতো লম্বাটে (যেমন সাপ)



54 নং চিত্র—পেশীর বিন্যাস-ব্যবস্থা : ক. পতঙ্গের দেহ-খণ্ডকে ; খ. পতঙ্গের পদে ; গ. ও ঘ. ব্যাঙের পশ্চাৎ-পদে।

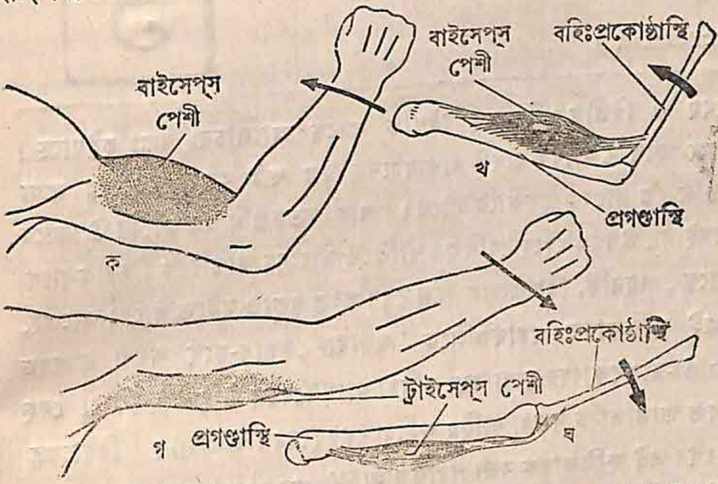
প্রাণীদের পেশীগুলি প্রধানতঃ ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত। ইহারা শিরদাঁড়ার কশেরুকাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিন্যস্ত থাকে। ইহাতে এই সমস্ত প্রাণীদের পক্ষে দেহকে পাশাপাশি আন্দোলিত করিয়া গমন করা সম্ভব হয়। পদ-যুক্ত স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তক এবং পদ-সংলগ্ন পেশীগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা এবং গুরুত্বপূর্ণ। ইহাদের সঙ্কোচনে এই সমস্ত প্রাণী মস্তক এবং পদ চালনা করিতে পারে (54 নং চিত্র—গ ও ঘ, 55 নং চিত্র)। মানুষের দেহে প্রায় 600 অস্থি-সংলগ্ন পেশী আছে।

পেশী-সঙ্কোচন (Muscular contraction)

আগে বলা হইয়াছে, পেশীর সঙ্কোচনে কোনও অংশের চলন হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়।

মানুষের হাত ভাঁজ হইয়া যাওয়া (Flexion) এবং সোজা হইয়া যাওয়া বা প্রসারিত হওয়া (Extension) অনেকগুলি পেশীর সঙ্কোচনের উপর নির্ভর করে। তবে, এই প্রক্রিয়ায় **বাইসেপ্‌স** (Biceps) এবং **ট্রাইসেপ্‌স** (Triceps) নামক পেশী দুইটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রথমোক্ত পেশী হাতের প্রগণ্ড(Upper arm)-এর সামনের দিকে অবস্থিত (55 নং চিত্র-ক) এবং

প্রধানতঃ প্রগণ্ডাস্থি (Humerus) ও বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি(Radius)-র সামনের দিকে যুক্ত (55 নং চিত্র-খ)। সঙ্কুচিত হইলে পেশী মোটা হইয়া যায় এবং উহার দুই প্রান্ত কাছাকাছি চলিয়া আসে। কাজেই, বাইসেপ্‌স পেশীর সঙ্কোচনে উহার দুই প্রান্ত কাছাকাছি আসে। ফলে, উহার দুই প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত অস্থি দুইটি(অর্থাৎ প্রগণ্ডাস্থি ও বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি)-ও কাছাকাছি আসে। ইহাতে হাত



55 নং চিত্র—ক, হইতে ঘ, মানুষের হাতের দুইটি প্রধান পেশীর অবস্থান এবং সঙ্কোচন।

ভাঁজ হইয়া যায়। ট্রাইসেপ্‌স পেশী প্রগণ্ডের পিছনদিকে থাকে (55 নং চিত্র-ঘ)। ইহার সঙ্কোচনে প্রগণ্ডাস্থি ও বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি পরস্পর দূরে চলিয়া যায়; ফলে, হাত সোজা হইয়া যায়। 54নং চিত্র-গ ও ঘ-এ ব্যাঙের পশ্চাৎ-পদের ভাঁজ ও সোজা হওয়ার সময় প্রধান প্রধান পেশীর অবস্থা দেখানো হইয়াছে।

রেখাঙ্কিত পেশী সাধারণতঃ খুব তাড়াতাড়ি, একনাগাড়ে, বার বার সঙ্কুচিত হইতে পারে। পতঙ্গের ডানা-সঞ্চালনকারী পেশী (50 নং চিত্র)-ই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পেশীর সঙ্কোচনের সময় অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়, সঞ্চিত গ্লাইকোজেনের পরিমাণ কমিয়া যায়, ল্যাকটিক অ্যাসিড (Lactic acid) জমা হয় এবং তাপ উৎপন্ন হয়। পেশীর সঙ্কোচন-রূপ কাজের জন্য শক্তি প্রয়োজন। পেশীতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন অক্সিজেন দ্বারা জারণের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল প্রস্তুত হয় এবং শক্তি নির্গত হয়।

রেচন
(Excretion)

5

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিপাক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বিপাকের ফলে কোষের মধ্যে নানাধরনের বস্তু সৃষ্টি হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বস্তু জীবের উপকারে লাগে। আর কতকগুলি বস্তু জীবের উপকারে ত লাগেই না, উপরন্তু দেহে বেশিক্ষণ থাকিলে জীবনের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে বাধা পড়ে ; এমনকি, বিষক্রিয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও ঘটিতে পারে। কাজেই, জীব এই ক্ষতিকারক পদার্থগুলিকে অদ্রাব্য কেলাস-রূপে অথবা কলয়েড (Colloid)-রূপে কোষের মধ্যে জমা করিয়া রাখে (যেমন উদ্ভিদরা), কিংবা দেহ হইতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, বাহির করিয়া দেয় (যেমন প্রাণীরা)। বিপাকের ফলে উৎপন্ন এই ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থগুলি(Waste products)-কে **রেচন-পদার্থ (Excretory products)** বলে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, মল(প্রধানতঃ খাদ্যের অপাচ্য অংশ)-ও একধরনের বর্জ্য পদার্থ। কিন্তু বিপাকের ফলে, এবং কোষের মধ্যে সৃষ্টি না হওয়ায়, ইহা রেচন-পদার্থ নয়। মলের সঙ্গে, অবশ্য, কয়েক ধরনের রেচন-পদার্থ মিশ্রিত থাকে। অতএব—

যে প্রক্রিয়ায় জীব বিপাকের ফলে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থ (রেচন-পদার্থ)-গুলিকে কোষের মধ্যে অদ্রাব্য কেলাস-রূপে অথবা কলয়েড-রূপে জমা করিয়া রাখিয়া, কিংবা দেহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া ইহাদের ক্ষতিকারক প্রভাব পরিহার করে, তাহাকে রেচন (Excretion) বলা হয়। রেচন একধরনের অপচিতি।

জীবনের অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজ্‌মের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখার জন্য প্রোটোপ্লাজ্‌মের মধ্যস্থ বিভিন্ন বস্তুর পরিমাণের সমতা সব সময়ে বজায় থাকা একান্ত প্রয়োজন। রেচনের দ্বারাই ইহা সম্ভব। পরের কয়েকটি পৃষ্ঠায় উদ্ভিদ এবং বিভিন্ন প্রাণীদের রেচন-পদার্থ, রেচন-যন্ত্র ও রেচনের কৌশল ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

উদ্ভিদের রেচন (Excretion in plants)

সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসন—উদ্ভিদের এই দুই বিপাকের ফলে উৎপন্ন জল (এবং মূলরোম দ্বারা শোষিত জলের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ) বাষ্পমোচনের দ্বারা পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে উদ্ভিদ-দেহের বাহিরে চলিয়া যায়। এইভাবে উদ্ভিদের দেহে জলের সমতা বজায় থাকে। শ্বসনের ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদের ক্ষেত্রে রেচন-পদার্থ নয়। কারণ, ইহা সালোকসংশ্লেষে প্রয়োজন হয়। তেমনি, সালোকসংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন অক্সিজেন উদ্ভিদের শ্বসনের কাজে লাগে।

বিপাকের ফলে উৎপন্ন অন্যান্য রেচন-পদার্থ সচরাচর উদ্ভিদ-দেহের মৃত ও শুষ্ক (যেমন—বল্কল, শুষ্ক পত্র, মৃত কাষ্ঠ প্রভৃতি) অংশে, অথবা জীবিত অংশের মৃত কোষের মধ্যে জমা থাকে ; কারণ, উদ্ভিদ-দেহে প্রাণীদের মতো রেচন-যন্ত্র নাই। নিচে উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন রেচন-পদার্থের বিষয়ে বলা হইল।

(ক) **ট্যানিন (Tannins)**—এই-জাতীয় বর্জ্য পদার্থ উদ্ভিদ-দেহের প্রায় সব অংশে, একটি অথবা একদল কোষের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে, বল্কল, সার-কাষ্ঠ এবং অনেক কাঁচা ফলে প্রচুর পরিমাণে ট্যানিন থাকে। চা-পাতায় 18% ট্যানিন থাকে। খয়ের, বস্তুতঃপক্ষে, একধরনের ট্যানিন।

(খ) **বান তৈল (Essential oils)**—বাতাবি লেবু, কমলা লেবু প্রভৃতি লেবু-জাতীয় উদ্ভিদের পত্রে ও ফলের খোসায় এবং অনেক সুগন্ধী পুষ্পের পাপড়িতে স্বচ্ছ বিন্দুর মতো তৈল-গ্রন্থি (Oil glands) নামের একধরনের বিশিষ্ট কলার মধ্যে বান তৈল পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণ তৈলের মতো নয়। কারণ, বান তৈল সুগন্ধী, উদ্বায়ী এবং মোটামুটি জলে দ্রাব্য।

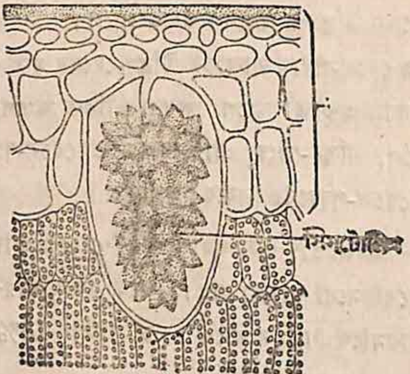
(গ) **রজন (Resins)**—পাইন-জাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ডে রজন-নালী (Resin ducts) নামের একধরনের বিশিষ্ট নলী বা নালী দেখা যায়। ইহার মধ্যে রজন জমা থাকে। রজন ঈষৎ হলুদ রঙের এবং কঠিন ও জলে অদ্রাব্য।

(ঘ) **গঁদ (Gums)**—বাব্‌লা, জিওল প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ডে এই ধরনের বর্জ্য পদার্থ পাওয়া যায়। গঁদ একধরনের জটিল কার্বোহাইড্রেট। কোষ-প্রাচীরের সেলুলোজ বিনষ্ট হইয়া গঁদ সৃষ্টি হয়। জলের সংস্পর্শে গঁদ ফুলিয়া উঠে। রজনের সঙ্গেও কিছু পরিমাণে গঁদ মিশ্রিত থাকে।

(ঙ) **খনিজ কেলাস (Mineral crystals)**—কয়েক ধরনের খনিজ লবণের কেলাস উদ্ভিদ-দেহে সৃষ্ট রেচন-পদার্থের অন্তর্গত। এই সমস্ত কেলাস কোষের ভ্যাকুওলের মধ্যে অথবা কোষ-প্রাকারে পাওয়া যায়। এইধরনের

খনিজ কেলাসের মধ্যে সচরাচর **সিলিকা** (Silica), **ক্যাল্‌শিয়াম কার্বোনেট** (Calcium carbonate) এবং **ক্যাল্‌শিয়াম অক্সালেট** (Calcium oxalate)-এর কেলাসই বেশি দেখা যায়।

সিলিকার কেলাস কোষ-প্রাকারের উপরে স্তরীভূত অবস্থায়, অথবা কোষ-প্রাকারের মধ্যে থাকে। ধান, যব, গম, আখ, বাঁশ প্রভৃতি তৃণ-জাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ড ও পত্রের বাহিরের তল খুব খস্‌খসে। এই সমস্ত অঙ্গে সিলিকা থাকায় এইরকম হয়। গমের খড়ে প্রায় 72% সিলিকা থাকে।

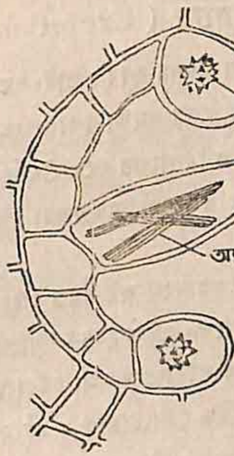


56 নং চিত্র—রবারের পত্রের কোষে সিস্টোলিথ।

রবার, বট প্রভৃতি উদ্ভিদের পত্রের বহুস্তর-যুক্ত ত্বকের অর্থাৎ যৌগিক ত্বকের ভিতরের দিকের স্তরে কতকগুলি বড় বড় কোষ থাকে। এই সব কোষের মধ্যে ক্যাল্‌শিয়াম কার্বোনেটের কেলাস গুচ্ছাকারে সজ্জিত থাকে. এই কেলাস-গুচ্ছকে **সিস্‌টোলিথ** (Cystolith) বলে। সিস্টোলিথ কতকটা আঙুর-গুচ্ছের মতো কোষের গহ্বরে ঝুলিতে দেখা যায়। আঙুর-গুচ্ছের বোঁটার মতো অংশটি সেলুলোজ-নির্মিত এবং কোষ-প্রাকারের ভিতরের তলে উৎপন্ন হয় (56 নং চিত্র)।

বিভিন্ন উদ্ভিদে নানা আকৃতির ক্যাল্‌শিয়াম অক্সালেটের কেলাস দেখা যায়। ইহাদের **র‍্যাফাইড্‌** (Raphides) বলা হয় (57 নং চিত্র)। কতকগুলি র‍্যাফাইডের কেলাস সূচের মতো, এবং কোষের মধ্যে পাশাপাশি গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত থাকে। ইহাদের **অ্যাসিকিউলার র‍্যাফাইড্‌** (Acicular raphides) বলে। কচুরিপানা, কচু, ওল প্রভৃতি উদ্ভিদে এইরকম কেলাস পাওয়া যায়। আবার, কচু এবং বড় পানার পত্রমূলের কোষে, এবং কচুরিপানার পত্রবৃন্তের কোষে তারকার মতো একধরনের কেলাস দেখা যায়। ইহাদের **স্ফিরাফাইড** (Sphaeraphides) বলা হয়। পিঁয়াজের শুষ্ক শল্ক-পত্রের কোষে অষ্টতলক, স্তম্ভাকার, দণ্ডের মতো নানা আকৃতির ক্যাল্‌শিয়াম অক্সালেট কেলাস পাওয়া যায়।

(চ) **তরুক্ষীর (Latex)**—কলা, তামাক প্রভৃতি উদ্ভিদে জলের মতো এবং করবী, বট, অশ্বত্থ, কাঁঠাল প্রভৃতি উদ্ভিদে দুধের মতো সাদা ও শিয়ালকাঁটা, আফিং প্রভৃতি উদ্ভিদে হলুদ রঙের দুধের মতো একরকম তরল থাকে। ইহাকে তরুক্ষীর বলে। তরুক্ষীরে অনেক সময় শ্বেতসার-কণা থাকে। ইহা প্রায় ক্ষেত্রেই বিষাক্ত হয়।



57 নং চিত্র—কচুর পত্রবৃন্তের কোষে র‍্যাফাইড।

ক্ষীরকলা (Laticiferous tissue) নামের বিশিষ্ট কলার মধ্যে তরুক্ষীর থাকে। আফিং, তামাক, কলা প্রভৃতি উদ্ভিদের ক্ষীরকলায় ক্ষীরবাহিকা (Latex vessels) থাকে। কতকগুলি সরু, প্রস্থ-প্রাকার-বিহীন এবং শাখান্বিত কোষ পরস্পর যুক্ত হইয়া জালিকার মতো ক্ষীরবাহিকা সৃষ্টি করে। করবী, আকন্দ প্রভৃতি উদ্ভিদের ক্ষীরকলায় ক্ষীরকোষ (Latex cells) নামের শাখান্বিত কোষ থাকে।

(ছ) **উপক্ষার (Alkaloids)**—ইহারা নাইট্রোজেন-ঘটিত জটিল যৌগ পদার্থ এবং সাধারণতঃ বীজ ও মূলে পাওয়া যায়। উপক্ষার তিক্ত স্বাদের হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষাক্তও বটে। সিঙ্কোনা (*Cinchona*) হইতে প্রাপ্ত কুইনাইন (Ouinine), তামাক গাছের নিকোটিন (Nicotine), আফিং গাছ হইতে প্রাপ্ত মর্‌ফিন (Morphine), চা এবং কফির ক্যাফিন (Caffeine) প্রভৃতি নানাধরনের উপক্ষারের উদাহরণ।

উদ্ভিদের রেচন-পদার্থগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমৃত্যু দেহের মধ্যে থাকে। ট্যানিন, তরুক্ষীর ও উপক্ষার তিক্ত স্বাদের এবং অনেক ক্ষেত্রে বিষাক্ত হয়। বান তৈলের কটু গন্ধ এবং রজন, গঁদ ও খনিজ কেলাসের অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়ার জন্য শাকাশী প্রাণীরা সাধারণতঃ এই উদ্ভিদগুলিকে এড়াইয়া চলে। অতএব, উদ্ভিদের রেচন-পদার্থ পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

উদ্ভিদের রেচন-পদার্থ মানুষেরও নানা উপকারে লাগে—ট্যানিন চর্ম-শিল্পে, বান তৈল আতর প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। রবার গাছের তরুক্ষীর হইতে

রবার এবং বিভিন্ন ধরনের উপক্ষার হইতে নানারকম ঔষধ প্রস্তুত হয়। গঁদ ও রজনের ব্যবহার সর্বজনবিদিত।

প্রাণীদের রেচন (Excretion in animals)

শ্বসনের ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল-ও রেচন-পদার্থ। দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের সমতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত জল, গ্যাস, নানারকম লবণ ও বিপাকের ফলে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থসহ নানারকম জৈব যৌগ দেহ হইতে নিয়মিত দূরীকরণ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। রেচনের দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়।

যদিও বিপাকের ফলে সৃষ্ট সমস্ত বর্জ্য পদার্থের দূরীকরণকে রেচন বলে, তবু প্রধানতঃ নাইট্রোজেন-ঘটিত রেচন-পদার্থের দূরীকরণই প্রাণীদের রেচনের প্রধান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে, প্রোটীনের বিপাকের ফলে উৎপন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটোপ্লাজ্‌ম গঠনের কাজে লাগে এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রাণীদের দেহে সঞ্চিত না থাকিয়া, নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়া, দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়—ইহাই রেচন। নিচে বিভিন্ন প্রাণীর রেচন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের রেচন (Excretion in invertebrates)

বিভিন্ন অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড হিসাবে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। মাকড়সাদের রেচন-পদার্থ গুয়ানিন (Guanine)। অল্প কয়েকটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী সরাসরি অ্যামাইনো অ্যাসিড রেচন করে।

অ্যামিবা (58 নং চিত্র-ক), প্যারামিসিয়াম এবং আরও অনেক জলজ এক-কোষী প্রাণীর ক্ষেত্রে কোষ-পর্দার মাধ্যমে সরাসরি ব্যাপনের দ্বারা রেচন সম্পন্ন হয়। এই সমস্ত প্রাণীর দেহে একটি কিংবা তাহার বেশি **সঙ্কোচী ভ্যাকুওল (Contractile vacuole)** থাকে। সাইটোপ্লাজ্‌ম হইতে অতিরিক্ত জল সঙ্কোচী ভ্যাকুওলের মধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং পূর্ণ হইয়া গেলে, এই ভ্যাকুওল ফাটিয়া যায়। এইভাবে সাইটোপ্লাজ্‌মের প্রয়োজনাতিরিক্ত জল দেহের বাহিরে চলিয়া যায় এবং দেহের জলসাম্য রক্ষা হয়। অ্যামোনিয়া ইহাদের রেচন-পদার্থ। স্পঞ্জ, এবং হাইড্রা (58 নং চিত্র-খ)-র রেচন-ও ব্যাপনের দ্বারা হয়।

চ্যাপ্টা কৃমিদের দেহে **ফ্লেম কোষ (Flame cells)** নামের সিলিয়া-যুক্ত একধরনের কোষ (59 নং চিত্র-ক)-এর সাহায্যে রেচন সম্পন্ন হয়। দেহের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত ফ্লেম কোষগুলি দ্বারা সংগৃহীত রেচন-পদার্থ শাখান্বিত একটি নালীতন্ত্র (58 নং চিত্র-গ, 59 নং চিত্র-ক)-এ প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে দেহের বাহিরে চলিয়া যায়।

উন্নতধরনের অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে রেচনের জন্য নির্দিষ্ট যন্ত্র থাকে। ইহাকে **রেচন-যন্ত্র (Excretory organs)** বলে। কেঁচোর রেচন-যন্ত্রের নাম **নেফ্রিডিয়া (Nephridia)**। প্রায় প্রতিটি দেহ-খণ্ডকে নেফ্রিডিয়া থাকে (58 নং চিত্র-ঘ)। প্রতিটি নেফ্রিডিয়াম (Nephridium) মূলতঃ প্যাঁচানো



58 নং চিত্র—প্রাণীদের রেচন-পদ্ধতি ও রেচন-যন্ত্র : ক. অ্যামিবা ; খ. হাইড্রা ; গ. চ্যাপ্টা কৃমি ; ঘ. কেঁচো ; ঙ. পতঙ্গ ; চ. ব্যাঙ ; ছ. ইঁদুর।

নলের মতো (59 নং চিত্র-খ)। ইহার ভিতরের প্রান্ত সিলিয়া-যুক্ত ফানেলের মতো এবং **নেফ্রোস্টোম (Nephrostome)** নামে পরিচিত। নেফ্রোস্টোম দেহ-গহ্বর বা সিলোম (Coelom) হইতে, এবং **টিউব্যুল (Tubule)** অর্থাৎ নলের মতো অংশ উহার চারদিকে অবস্থিত রক্ত-জালকের রক্ত হইতে রেচন-পদার্থ সংগ্রহ করে। **নেফ্রিডিওপোর (Nephridiopore)** নামের রন্ধ্রের সাহায্যে নেফ্রিডিয়াম দ্বারা সংগৃহীত রেচন-পদার্থ দেহের বাহিরে চলিয়া যায়।

শুঙ্গ-গ্রন্থি (Antennary glands) নামক রেচন-যন্ত্রের সাহায্যে চিংড়ি প্রভৃতি কবচী (Crustaceans) প্রাণীরা রেচন সম্পন্ন করে। একটি করিয়া প্রান্ত-থলি (End-sac) এবং উহা হইতে উৎপন্ন একটি নালী নিয়া শুঙ্গ-গ্রন্থি

গঠিত। নালীটি শুঙ্গের গোড়ায় একটি রেচন-রন্ধ্র (Excretory pore)-এর সাহায্যে বাহিরের সঙ্গে যুক্ত।

পতঙ্গ এবং আরও কয়েক ধরনের সন্ধিপদী প্রাণীদের প্রধান রেচন-যন্ত্রের নাম **ম্যাল্‌পিজিয়ান টিউব্যুল (Malpighian tubules)**। ইহারা সূক্ষ্ম রেশমী সুতার মতো দেখিতে এবং পশ্চাৎ-পৌষ্টিক নালীর অগ্র-ভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকে (58 নং চিত্র-ঙ, 59 নং চিত্র-গ)। নাইট্রোজেন-ঘটিত লবণের দ্রবণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি রেচন-পদার্থ হিমোসিল (Haemccoel) বা দেহ গহ্বরের রক্ত হইতে ম্যাল্‌পিজিয়ান টিউব্যুলের মধ্যে ব্যাপন পদ্ধতিতে



59 নং চিত্র—ক. ফ্লেম কোষ, খ. নেফ্রিডিয়াম এবং গ. ম্যাল্‌পিজিয়ান টিউব্যুলের অবস্থান ঘ. ম্যাল্‌পিজিয়ান টিউব্যুলের সাহায্যে রেচনের কৌশল।

প্রবেশ করে। পরে জল এবং আরও কয়েকটি বস্তু আবার টিউব্যুলের প্রাকারে শোষিত হয় (59 নং চিত্র-ঘ)। বাকী রেচন-পদার্থ পৌষ্টিক নালীর গহ্বরে মুক্ত হয় এবং মলের সঙ্গে দেহের বাহিরে চলিয়া যায়। **মেদপুঞ্জ (Fat body)**-এর সাহায্যে পতঙ্গেরা অংশতঃ রেচন করে। পতঙ্গ এবং আরও অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের **বহিঃকঙ্কাল (Exoskeleton)**-এর সাহায্যে রেচন-পদার্থ দেহের বাহিরে চলিয়া যায়। রেচন-পদার্থগুলি বহিঃকঙ্কালে জমা হয়। খোলস-ত্যাগ (Moulting)-এর সময়, খোলসের সঙ্গে রেচন-পদার্থগুলিও বহিষ্কৃত হয়।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রেচন (Excretion in vertebrates)

একজোড়া **বৃক্ক (Kidneys)** মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রধান রেচন-যন্ত্র। ইহারা দেহ-গহ্বরের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখার দুই পাশে থাকে। মৎস্যদের বৃক্ক খুব লম্বা এবং প্রায় মস্তক পর্যন্ত বিস্তৃত। ব্যাঙের বৃক্ক কতকটা উপবৃত্তাকার (58 নং চিত্র-চ)। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বৃক্ক বরবটির বীজের মতো আকৃতির (58 নং চিত্র-ছ)।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৃক্ক হইতে একটি নালী উৎপন্ন হয়। ইহাকে **গবিনী** (Ureter) বলে। উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী, এবং হংসচঞ্চু (Platypus) ও ক্যাঙারু প্রভৃতি কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে, দুই পাশের গবিনী দুইটি অবসারণীর সঙ্গে যুক্ত। এই সমস্ত প্রাণীদের অবসারণীর সঙ্গে **মূত্রাশয়** বা **মূত্রস্থলী** (Urinary bladder) নামের একটি থলি যুক্ত থাকে। পক্ষীদের, অবশ্য, মূত্রাশয় থাকে না। অধিকাংশ স্তন্যপায়ীদের গবিনী দুইটি সরাসরি মূত্রাশয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। মূত্রাশয় সাময়িকভাবে মূত্র জমা করিয়া রাখে। মূত্রাশয় হইতে উৎপন্ন **মূত্রনালী** (Urethra) নামের একটি নালীর মাধ্যমে রেচন-পদার্থ (মূত্র) দেহের বাহিরে চলিয়া যায়। পুরুষ স্তন্যপায়ী প্রাণীর মূত্রাশয় পুংজননেন্দ্রিয় (Penis)-এর মধ্য দিয়া, এবং স্ত্রী স্তন্যপায়ী প্রাণীর মূত্রাশয় সরাসরি বাহিরের সঙ্গে যুক্ত।

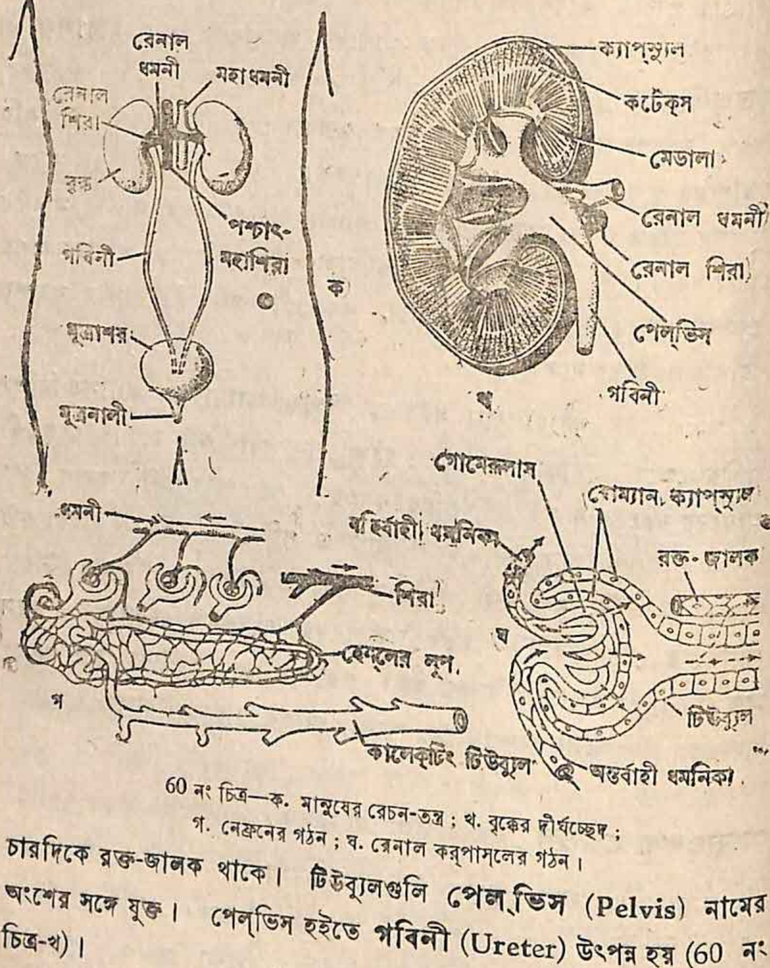
আগে (98 পৃষ্ঠায়) বলা হইয়াছে, উদ্বৃত্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়া রেচন-পদার্থ সৃষ্টি করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের যকৃতের দ্বারাই এই পরিবর্তন হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণী, কচ্ছপ এবং উভচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে অ্যামাইনো অ্যাসিড পরিবর্তিত হইয়া ইউরিয়া সৃষ্টি করে। টিকটিকি, সর্প এবং পক্ষীদের ক্ষেত্রে, ইউরিয়ার পরিবর্তে ইউরিক অ্যাসিড-ই রেচন-পদার্থ। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের এই সমস্ত রেচন-পদার্থ তরল **মূত্র** (Urine) হিসাবে পরিত্যক্ত হয়। সরীসৃপ এবং পক্ষীদের মূত্র, অবশ্য, অর্ধ-তরল এবং মলের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় দেহের বাহিরে পরিত্যক্ত হয়।

মানুষের রেচন (Excretion in man)

মানুষের বৃক্ক **ক্যাপ্‌স্যুল** (Capsule) নামের কলা দিয়া বেষ্টিত থাকে (60 নং চিত্র-খ)। বৃক্কের প্রধান অংশ দুইটি স্তরে বিন্যস্ত। বাহিরের দিকের স্তরকে **কর্টেক্স** (Cortex) এবং ভিতরের দিকের স্তরকে **মেডালা** (Medulla) বলে। কর্টেক্সে প্রায় দশ লক্ষ **নেফ্রন** (Nephrons) থাকে।

নেফ্রনের দুইটি অংশ—প্রথম অংশের নাম **ম্যাল্‌পিজিয়ান কর্‌পাস্‌ল** (Malpighian corpuscle) বা **রেনাল কর্‌পাস্‌ল** (Renal corpuscle) এবং দ্বিতীয় অংশের নাম **টিউব্যুল** (Tubule)। **গ্লোমেরুলাস** (Glomerulus) নামের একগুচ্ছ ধমনিকা এবং উহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত **বোম্যান ক্যাপ্‌স্যুল** (Bowman capsule) নামের দুই-প্রাকার-যুক্ত

বর্তুলাকার অংশ দিয়া রেনাল করপাস্‌ল গঠিত (60 নং চিত্র-ঘ)। টিউব্যুলের কিছু অংশ সোজা এবং কিছু অংশ প্যাচানো (60 নং চিত্র-গ)। টিউব্যুলের



60 নং চিত্র—ক. মানুষের রেচন-তন্ত্র ; খ. বৃক্কের দীর্ঘচ্ছেদ ;
গ. নেফ্রনের গঠন ; ঘ. রেনাল করপাসলের গঠন।

চারদিকে রক্ত-জালক থাকে। টিউব্যুলগুলি **পেলভিস (Pelvis)** নামের অংশের সঙ্গে যুক্ত। পেল্‌ভিস হইতে **গবিনী (Ureter)** উৎপন্ন হয় (60 নং চিত্র-খ)।

মূত্র-প্রস্তুতি (Formation of urine)

অব্যবহৃত প্রোটীন **ডিঅ্যামাইনেজ (Deaminase)** নামক উৎসেচকের উপস্থিতিতে অ্যামোনিয়ায় রূপান্তরিত হয়। এই তীব্র বিষাক্ত পদার্থ রক্ত-বাহিত হইয়া যকৃতে পৌঁছিলে, উহা **আর্জিনেজ (Arginase)** নামক উৎসেচকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়া, ইউরিয়া এবং জল উৎপন্ন করে।

যকৃতে প্রস্তুত ইউরিয়া অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে রক্ত-বাহিত হইয়া রেনাল ধমনীর মাধ্যমে বৃক্কে পৌছায়। রক্ত ধমনী হইতে ধমনিকায় এবং সেখান হইতে অবশেষে রেনাল কর্পাস্লের গ্লোমেরুলাসে প্রবেশ করে (60 নং চিত্র-ঘ)। রক্তের চাপের জন্য, রক্তের তরল অংশ (প্রোটীন ছাড়া) গ্লোমেরুলাস হইতে বোমান ক্যাপ্স্যুলে এবং সেখান হইতে টিউব্যুলের গহ্বরে চলিয়া যায়। ইহা, বস্তুতঃপক্ষে, রক্তের পরিস্রাবণ।

মূত্র-প্রস্তুতির দ্বিতীয় পর্যায়ে, টিউব্যুলের গহ্বরের মধ্যস্থ তরল হইতে টিউব্যুলের প্রাকারের কোষ কয়েকটি নির্দিষ্ট পদার্থ শোষণ করে। এই শোষণ প্রধানতঃ টিউব্যুলের প্যাঁচানো অংশে এবং অংশতঃ **হেন্‌লের লূপ (Loop of Henle)** নামক অংশ(60 নং চিত্র-গ)-এ সম্পন্ন হয়। শোষণের বিশেষত্ব এই যে, প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি (যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি) বেশি পরিমাণে শোষিত হয়। অপরপক্ষে, ক্ষতিকারক ইউরিয়ার সামান্য অংশই শোষিত হয়—বেশির ভাগই মূত্রের সঙ্গে দেহের বাহিরে চলিয়া যায়। শোষিত পদার্থগুলি টিউব্যুলের প্রাকার-সংলগ্ন রক্ত-জালকের রক্তে চলিয়া যায়। গ্লোমেরুলাসের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় 205 লিটার তরল রক্ত হইতে টিউব্যুলে প্রবেশ করে। কিন্তু 202 লিটার আবার শোষিত হয় এবং মাত্র দেড় হইতে আড়াই লিটার তরল মূত্র হিসাবে নির্গত হয়। বলা বাহুল্য, মূত্রের বেশির ভাগ অংশই জল।

মূত্রত্যাগ (Urination)

বৃক্কে মিনিটে এক ঘন সেন্টিমিটার হিসাবে মূত্র প্রস্তুত হয়। ইহা গবিনীর মধ্য দিয়া মূত্রাশয়ে জমা হইতে থাকে। ইহাতে মূত্রাশয়ের আয়তন ক্রমেই বাড়িতে থাকে বলিয়া, মূত্রাশয়ের মধ্যে মূত্রের চাপ বাড়ে না। তবে, 700 হইতে 800 ঘন সেন্টিমিটার মূত্র সঞ্চিত হওয়ার পর মূত্রত্যাগের প্রবল বেগ হয়। তখন মূত্রাশয়ের প্রাকার সঙ্কুচিত হয় এবং একই সময়ে মূত্রনালীর স্ফিংটার (Sphincter) পেশী শ্লথ হইয়া যায়। ফলে, মূত্র মূত্রাশয় হইতে মূত্রনালীতে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে দেহের বাহিরে চলিয়া যায়।

রেচনের অন্যান্য উপায় (Other means of excretion)

শ্বসন (বিপাক)-এর ফলে সৃষ্ট কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল রক্ত হইতে ফুসফুসের মাধ্যমে দেহের বাহিরে চলিয়া যায়।

যকৃৎ যে কেবল অ্যামোনিয়াকে ইউরিয়ায় পরিবর্তিত করে, তাহাই নয়; ইহা বিনষ্ট লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন বিশ্লিষ্ট করিয়া, বিলিরুবিন (Bilirubin) এবং বিলিভার্ডিন (Biliverdin) নামের রেচন-পদার্থ সৃষ্টি করে। এইগুলি পিত্তের সঙ্গে ক্ষুদ্রান্ত্রের গহ্বরে প্রবেশ করে এবং শেষে মলের সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়। কোলেস্টেরল (Cholesterol) নামক যকৃত দ্বারা সৃষ্ট আর একরকম রেচন-পদার্থ এবং কিছু পরিমাণে জল-ও এই উপায়ে দেহের বাহিরে চলিয়া যায়।

মানুষের চর্মে **স্বেদগ্রন্থি** (Sweat glands) থাকে। স্বেদগ্রন্থি হইতে নিঃসৃত ঘর্মের মাধ্যমে জল, কয়েক ধরনের লবণ, কিছু কিছু নাইট্রোজেন-ঘটিত রেচন-পদার্থ এবং খুব সামান্য পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিষ্কাশিত হয়। ঘর্মের দ্বারা সচরাচর অল্প পরিমাণে জল নির্গত হইয়া যায়, কিন্তু বেশি পরিমাণে ঘর্ম হইলে, দৈনিক 13·5 লিটার পর্যন্ত জল এই উপায়ে দেহের বাহিরে যাইতে পারে। তখন দেহে জল এবং লবণের সমতা বজায় রাখার জন্য বেশি করিয়া জল পান এবং লবণাক্ত খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়।

6

মৃত্তিকা, ভাইরাস ও মাইক্রোব
(Soil, Virus and Microbes)

মৃত্তিকা (Soil)

স্থলের যে অংশে উদ্ভিদ জন্মায়, তাহাকে মাটি বা **মৃত্তিকা (Soil)** বলা হয়। অবশ্য, জলের নিচে যে কঠিন অংশে উদ্ভিদ জন্মায়, তাহাকেও মৃত্তিকা বলে। মরুভূমির উদ্ভিদ-বিহীন বালির স্তূপ অথবা পাহাড়-পর্বতের বন্ধ্যা শিলাস্তূপকে মৃত্তিকা বলা হয় না। মৃত্তিকার সঙ্গে উদ্ভিদের সম্পর্ক নিবিড়। মৃত্তিকার অজৈব লবণ এবং জল উদ্ভিদের প্রাথমিক খাদ্যোপাদান।

মৃত্তিকা একধরনের মিশ্র পদার্থ। ইহা নানারকম অজৈব যৌগ, জৈব যৌগ, খনিজ লবণ, জীবাণু, ছত্রাক প্রভৃতির মিশ্রণে গঠিত। সমস্ত মাটিতে কম-বেশি জল এবং বায়ু থাকে।

শিলা (Rock) হইতে মাটি সৃষ্টি হয়। তাপ, শৈত্য, বৃষ্টিপাত, বায়ু-প্রবাহ ইত্যাদি নানারকম প্রাকৃতিক পরিবর্তনের প্রভাবে এই শিলা ক্রমে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ শিলা নানারকম জৈব পদার্থের সঙ্গে মিশিয়া মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়। কোনও শিলা হইতে সৃষ্টি হইয়া মৃত্তিকা যদি ঐ শিলাকে বেষ্টন করিয়া থাকে, অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থলেই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ঐরকম মৃত্তিকাকে **স্থানীয় মৃত্তিকা (Local soil)** বলা হয়। স্থানীয় মৃত্তিকার ঠিক নিচে আংশিক চূর্ণিত, এবং তাহারও নিচে অবিকৃত জনিতৃ-শিলার স্তর থাকে। দাক্ষিণাত্যের কালো মাটি এবং সাঁওতাল পরগনার লাল মাটি স্থানীয় মৃত্তিকার উদাহরণ। অনেক সময় মৃত্তিকা জল অথবা বায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া, উৎপত্তি-স্থল হইতে বহুদূরে স্থানান্তরিত হয়। এইরকম মৃত্তিকাকে **স্থানান্তরিত মৃত্তিকা (Transported soil)** বলে। নদীর জলে বাহিত হইয়া কাদা-মাটি ও বালি সমুদ্রের নিকট নদীর মোহনায় স্তরে স্তরে জমা হয়। এইরকম স্থানান্তরিত মৃত্তিকাকে **পাললিক মৃত্তিকা (Sedimentary soil)** বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশ পাললিক মৃত্তিকা দিয়া গঠিত। জল ছাড়া, প্রবল বায়ু-প্রবাহের সাহায্যে মৃত্তিকা স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। মধ্য-এশিয়ার **লোয়েস (Loess)** মৃত্তিকা স্থানান্তরিত মৃত্তিকার উদাহরণ।

মৃত্তিকার প্রকারভেদ (Types of soil)

সূক্ষ্মতার তারতম্য অনুসারে, মৃত্তিকা-কণাগুলি(Soil particles)-কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, (ক) **বালু-কণা** (Sand particles)—ইহাদের ব্যাস 2 হইতে 0·02 মিলিমিটার পর্যন্ত ; (খ) **পলি-কণা** (Silt particles)—ইহাদের ব্যাস 0·02 হইতে 0·002 মিলিমিটার পর্যন্ত ; (গ) **কর্দম-কণা** (Clay particles)—ইহাদের ব্যাস 0·002 মিলিমিটারের চেয়ে কম। 2 মিলিমিটারের বেশি ব্যাস-যুক্ত মৃত্তিকা-কণাকে **কাঁকর** (Gravels) বলা হয়। বিভিন্ন মৃত্তিকা-কণার আপেক্ষিক পরিমাণ এবং অন্যান্য অজৈব ও জৈব পদার্থের উপস্থিতি অনুসারে মৃত্তিকার প্রকারভেদ করা হয়। ভারতে প্রধানতঃ নিচে লিখিত কয়েক ধরনের মৃত্তিকা পাওয়া যায়।

(1) **বেলেমাটি** (Sandy soil)—এইরকম মাটিতে শতকরা 80 ভাগেরও বেশি বালু কণা এবং 10 ভাগেরও কম কর্দম-কণা থাকে ; অজৈব লবণ এবং জৈব পদার্থ থাকে না বলিলেও চলে।

বেলে মাটির সংসক্তি (Cohesion) খুবই কম ; কাজেই, জল দিয়া পিণ্ড পাকানো কঠিন। খুব বেশি সচ্ছিদ্র বলিয়া, ইহা বেশিমাত্রায় জল শোষণ করিলেও, শোষিত জলের বেশির ভাগই বাহির হইয়া যায়, অর্থাৎ, ইহার জল-ধারণ ক্ষমতা খুবই কম। তবে, ইহার মধ্য দিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে বায়ু চলাচল করিতে পারে। বেলে মাটি অনমনীয়, সহজেই শুকাইয়া যায় এবং রৌদ্রে তাড়াতাড়ি গরম হইয়া যায়।

বালু-কণার ব্যাস 1 মিলিমিটারের চেয়ে বেশি হইলে এবং ছোট-বড় পাথর-কুচি অথবা কাঁকর মিশানো থাকিলে, ঐরকম বেলে মাটিকে **কাঁকর মাটি** (Gravelly soil)-ও বলা হয়। কাঁকর মাটিতে সচরাচর ফণিমনসা, তেশিরা-মনসা, আকাশমণি ইত্যাদি জাঙ্গল উদ্ভিদ (Xerophytes) জন্মিয়া থাকে। চাষ-আবাদের পক্ষে এই মাটি সম্পূর্ণ অনুপযোগী। বালু-কণা সূক্ষ্ম হইলে এইরকম মাটিতে শসা, কুমড়া, পটোল, তরমুজ ইত্যাদি কুষ্মাণ্ড গোত্রের উদ্ভিদ জন্মাইতে পারে।

(2) **দোআঁশ মাটি** (Loamy soil)—এইরকম মাটিতে বালু-কণা ও পলি-কণার পরিমাণ মোটামুটি সমান। দোআঁশ মাটিতে শতকরা 40 ভাগ হইতে 45 ভাগ বালু-কণা, 30 হইতে 40 ভাগ পলি-কণা, 10 হইতে 15 ভাগ কর্দম-কণা, প্রায় 5 ভাগ চুন এবং ঐ পরিমাণে জৈব পদার্থ থাকে।

দোআঁশ মাটির জলধারণ-ক্ষমতা, জলশোষণ-ক্ষমতা, নমনীয়তা, সংসক্তি ও বায়ু-চলাচল-ক্ষমতা মাঝামাঝি বলিয়া, ইহা সাধারণ চাষ-আবাদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপযোগী। বালু-কণা, পলি-কণা ও কর্দম-কণার আপেক্ষিক পরিমাণ অনুযায়ী, কয়েক রকমের দোআঁশ মাটি দেখা যায়।

(3) **এঁটেল মাটি বা কাদা মাটি (Clayey soil)**—এইধরনের মাটিতে শতকরা 10 হইতে 20 ভাগ সূক্ষ্ম বালু-কণা, মোটামুটি 30 ভাগ পলি-কণা এবং 45 হইতে 50 ভাগ কর্দম-কণা ও জৈব পদার্থ থাকে।

এঁটেল মাটির জলধারণ-ক্ষমতা, নমনীয়তা, সংসক্তি ও জলশোষণ-ক্ষমতা খুব বেশি; কিন্তু ছিদ্র কম থাকায়, ইহার বায়ু-চলাচল ও জল-নিষ্কাশনের ক্ষমতা কম। জলের সংস্পর্শে ইহা নরম হয় এবং আয়তনে বাড়িয়া যায়; শুকাইয়া গেলে, আয়তনে কমে এবং ফাটিয়া যায়। চাষের পক্ষে এই মাটি উপযুক্ত নয়। কাদা মাটিতে আম, জাম ইত্যাদি কিছু-সংখ্যক সাধারণ ভূমিজ উদ্ভিদ জন্মায়।

(4) **পলি-মাটি (Silty soil)**—পলি-মাটিতে শতকরা 15 হইতে 20 ভাগ সূক্ষ্ম বালু-কণা, 50 হইতে 60 ভাগ পলি-কণা এবং 20 হইতে 30 ভাগ কর্দম-কণা থাকে।

পলি-মাটির জলধারণ-ক্ষমতা ও অন্যান্য ধর্ম মাঝামাঝি ধরনের। কাজেই, এই মাটিতে সমস্ত শ্রেণীর ফসল, বিশেষতঃ রবিশস্য, ভালভাবে জন্মায়।

(5) **লোনা মাটি (Saline soil)**—সমুদ্রোপকূলে অথবা নদীর মোহনায় এইরকম মাটি দেখা যায়। ইহা দোআঁশ মাটির মতো; তবে ইহাতে বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণ বেশি পরিমাণে থাকে। লোনা মাটিতে প্রচুর পরিমাণে জিপ্সাম (Gypsum), ম্যাগ্নেশিয়াম এবং সোডিয়ামের লবণ থাকে।

প্রচুর পরিমাণে খনিজ লবণ থাকায়, লোনা মাটিতে সাধারণ স্থলজ উদ্ভিদ জন্মায় না। সেজন্য, ইহাকে **শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মৃত্তিকা (Physiologically dry soil)** বলা হয়। লোনা মাটিতে সুঁদরি, গরান, বানী, তাল, নারিকেল প্রভৃতি লবণাম্বু উদ্ভিদ জন্মায়।

(6) **চুনামাটি (Calcareous soil)**—ইহাও একরকম বেলে মাটি; তবে, এইরকম মাটিতে প্রচুর পরিমাণে (শতকরা 8 হইতে 45 ভাগ) চুন বা ক্যাল্‌শিয়াম কার্বোনেট থাকে।

বেলে মাটির মতো গ্রথন হইলেও, চুনামাটির জলধারণ-ক্ষমতা বেশি। ইহা ক্ষারধর্মী। গোলাপ, তুলসী, লেবু প্রভৃতি চুনামাটিতে জন্মায়।

(7) **লাল মাটি (Red soil)**—এইরকম মাটির গঠন এঁটেল মাটির মতো ; তবে, ইহাতে বেশি পরিমাণে লৌহ এবং অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium) থাকায়, ইহার রঙ লাল। ইহাতে খুব অল্প পরিমাণে জৈব পদার্থ থাকে। এইরকম মাটির ধর্ম এঁটেল মাটির মতো, কিন্তু ইহা অম্লধর্মী। লাল মাটিতে তূলা, চিনাবাদাম প্রভৃতি উদ্ভিদ জন্মায়।

(8) **পচা মাটি (Peat soil) বা বোদ (Humus)**—বেলে মাটি, এঁটেল মাটি, গলিত ও পচনশীল উদ্ভিদ (উদ্ভিদের ভূনিম্নস্থ অংশ, ছত্রাক, মস-জাতীয় উদ্ভিদ), প্রাণীর গলিতদেহ, কেঁচো, নাইট্রিফাইং জীবাণু (Nitrifying bacteria), চুন, নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন অনুপাতে থাকিয়া নানাধরনের পচা মাটি সৃষ্টি করে। এই মাটি সচরাচর অম্লধর্মী ; তবে, প্রশম অথবা ক্ষারধর্মী-ও হইতে পারে। এই মাটির জলধারণ-ক্ষমতা বেশি। পচা মাটি চা ও গোলাপ চাষের উপযোগী। পচা মাটিতে শতকরা 60 ভাগ বেলে মাটি মিশাইয়া, অন্যান্য ফসলের উপযোগী করা যায়।

মাইক্রোব ও ভাইরাস (Microbes and Virus)

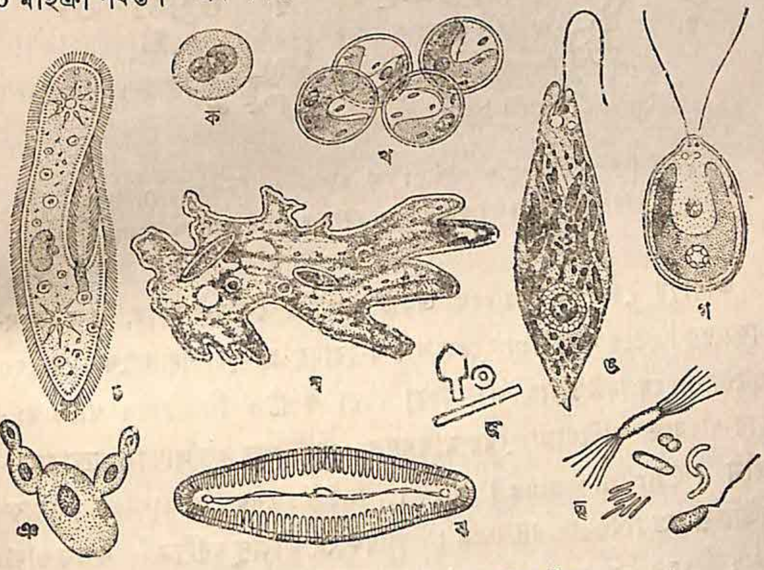
যে সমস্ত জীব আণুবীক্ষণিক (অর্থাৎ অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না), তাহাদের সাধারণভাবে **আণুবীক্ষণিক জীব (Micro-organisms)** বা **মাইক্রোব** (Microbes) বলে। মাইক্রোব সাধারণতঃ এককোষী ; অথবা বহুকোষী হইলেও, খুব অল্প-সংখ্যক কোষ নিয়া গঠিত। অনেক সময়, একই প্রজাতি (Species)-র অসংখ্য সদস্য একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে থাকায়, ইহাদের খালি চোখেও দেখা যায়।

সংজ্ঞা অনুসারে, এককোষী উদ্ভিদ এবং প্রাণী, সমস্ত জীবাণু (Bacteria) এবং ভাইরাস (Virus) নামক সূক্ষ্মদেহী বস্তু এই গোষ্ঠীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে ভাইরাস ছাড়া অন্য সমস্ত জীব আলোক-নিয়ন্ত্রিত অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Light-microscope)-এর সাহায্যে দেখা যায়। ভাইরাস ইলেক্‌ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Electron microscope) ছাড়া দেখা যায় না। মাইক্রোব অসমসত্ত্ব (Heterogenous) জীবগোষ্ঠী : ইহাদের বিভিন্ন সদস্যের আকৃতি ও প্রকৃতির সাদৃশ্য কম, অথবা নাই বলিলেই চলে। ইহাদের কতকগুলির মধ্যে প্রাণীর ধর্ম (যেমন, অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম ইত্যাদি), আবার কতকগুলির মধ্যে উদ্ভিদ-কোষের বৈশিষ্ট্য (যেমন, ক্লামাইডোমোনাস, ভল্‌ভক্‌স, ঈস্ট ইত্যাদি)

দেখা যায়। নিচে জীবাণু, জীবাণু-সদৃশ উদ্ভিদ নীল-হরিৎ শেওলা (Blue-green algae) এবং ভাইরাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

জীবাণু (Bacteria)

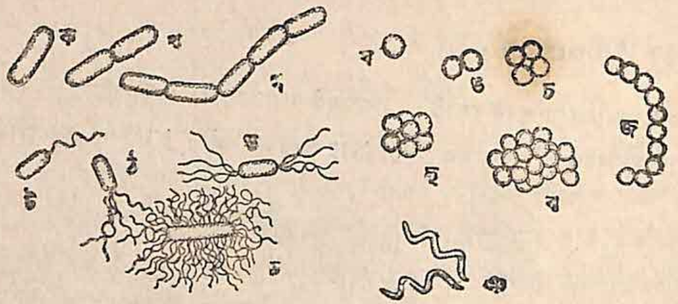
ইহারা আকারে খুবই ছোট। কোষের ব্যাস অথবা দৈর্ঘ্য গড়ে 0·5 হইতে 2·0 মাইক্রা পর্যন্ত। এক ঘন সেন্টিমিটার জায়গায় প্রায় 10^{12}-সংখ্যক জীবাণু



61 নং চিত্র—বিভিন্ন ধরনের আণুবীক্ষণিক জীব :
ক. প্রোটোকক্কাস (*Protococcus*) ; খ. ক্লোরেলা (*Chlorella*) ; গ. ক্ল্যামাইডোমোনাস ;
ঘ. অ্যামিবা ; ঙ, ইউগ্লিনা (*Euglena*) ; চ. প্যারামিসিয়াম ; ছ. কয়েক ধরনের জীবাণু ;
জ. কয়েক ধরনের ভাইরাস ; ঝ. ডায়াটম (Diatom) ; ঞ. ঈস্ট

স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। 10° হইতে 70° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায়, এবং বায়ু হইতে সমুদ্রের গভীর তলদেশ পর্যন্ত, পৃথিবীর সব রকম পরিবেশে জীবাণু বসবাস করে। ইহাদের কোষের আকার প্রধানতঃ তিন রকম। যেমন—(1) কক্কাস (Coccus)—বর্তুলায়, (2) **ব্যাসিলাস** (Bacillus)—দণ্ডের মতো এবং (3) **স্পাইরিলাম** (Spirillum)—সর্পিলাকার। কক্কাস এবং ব্যাসিলাসের কোষগুলি অনেক সময় দলবদ্ধ (Colony) অথবা শৃঙ্খলাবদ্ধ (Chain) অবস্থায় থাকে। কতকগুলি ব্যাসিলাস এবং স্পাইরিলাম শ্রেণীর জীবাণুর কোষে সূতার মতো সরু গঠন থাকে। ইহাদের ফ্লাজেলা বলা হয়। কোষের এক-প্রান্তে

একটি, অথবা দুই-প্রান্তে দুইটি গুচ্ছ, কিংবা কোষের সমগ্র তলে অসংখ্য ফ্লাজেলা উৎপন্ন হয়। ফ্লাজেলার সাহায্যে ইহারা গমন করিতে পারে।



52 নং চিত্র—বিভিন্ন ধরনের জীবাণুঃ ক. হইতে গ. তিন রকম ব্যাসিলাস ; ঘ. হইতে ঝ. ছয় রকম কক্কাস ; ঞ. হইতে ঢ. পাঁচ রকম স্পাইরিলাম।

জীবাণুর কোষের চারদিকে একটি সুগঠিত কোষ-প্রাকার, এবং কোষ-প্রাকারের ভিতরে সাইটোপ্লাজ্‌মের পরিধি-বরাবর প্লাজ্‌মা পর্দা থাকে। কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌মে নিউক্লিয়ার পর্দা দিয়া ঘেরা সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না ; ইহার পরিবর্তে সাইটোপ্লাজ্‌মের মাঝখানে একটি মাত্র বর্তুলাকার **ক্রোমোজোম (Chromosome)** থাকে। নিউক্লিয়াসের মতো এই গঠনকে **নিউক্লিয়এড (Nucleoid)** বলে। অধিকাংশ জীবাণু বর্ণহীন। কতকগুলি জীবাণু (যেমন—সাল্‌ফার, জীবাণু) অবশ্য, রঙিন। ইহাদের কোষে প্লাসটিড (Plastids), গল্‌জি বস্তু (Golgi materil), মাইটোকন্‌ড্রিয়া ইত্যাদি প্রোটোপ্লাজ্‌মীয় বস্তু থাকে না।

জীবাণুর মধ্যে নানাধরনের বিপাক দেখা যায়। অধিকাংশ জীবাণু মৃতজীবী অথবা পরজীবী ; অল্প কিছু-সংখ্যক জীবাণু স্বভোজী এবং সালোক-সংশ্লেষ করিতে পারে। তবে শেষোক্ত ক্ষেত্রে, জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইড (Hydrogen sulphide) প্রয়োজন হয় এবং অক্সিজেনের পরিবর্তে সাল্‌ফার নির্গত হয়।

অধিকাংশ জীবাণু অবাত শ্বসন করে। ফলে, অন্তঃস্তরে ইথাইল অ্যাল্‌কোহল, অ্যাসেটিক অ্যাসিড (Acetic acid) ইত্যাদি যৌগ সৃষ্টি হয়। অল্প কিছু-সংখ্যক জীবাণু সবাত শ্বসন করিতে পারে।

সমস্ত জীবাণু দ্রুতহারে বংশ-বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহারা শুধু দ্বিভাজন (**Binary fission**) নামক অযৌন-পদ্ধতিতে বংশ-বৃদ্ধি করে। এইধরনের জনন খুবই সরল ঃ একটি কোষ মাইটোসিস (Mitosis) প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া দুইটি কোষ উৎপন্ন করে। অনুকূল পরিবেশে ইহারা আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর জনন সম্পন্ন করে।

বেশ কিছু-সংখ্যক জীবাণু, মানুষ, অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের দেহে পরজীবী-রূপে থাকিয়া রোগের সৃষ্টি করে। ইহাদের **রোগজনক জীবাণু (Pathogenic bacteria)** বলে। নিচে মানুষের কয়েকটি রোগ এবং সংশ্লিষ্ট রোগজনক জীবাণুর নাম দেওয়া হইল।

প্লেগ (Plague)—প্যাস্‌ট্যুরেলা পেস্‌টিস (*Pasteurella pestis*), কলেরা (Cholera)—ভিব্রিও কোমা (*Vibrio comma*), টাইফয়েড (Typhoid)—সাল্‌মোনেলা টাইফোসা (*Salmonella typhosa*), যক্ষ্মা (Tuberculosis)—মাইকোব্যাক্‌টেরিয়াম টিউবার্‌কুলোসিস (*Mycobacteruim tuberculosis*), ডিপ্‌থেরিয়া (Diptheria)—কর্নিব্যাক্‌টেরিয়াম ডিপ্‌থেরী (*Cornibacterium diptheriae*), ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus)—ক্লস্‌ট্রিডিয়াম টিটেনী (*Clostridium tetani*)।

কোনও বস্তুকে জীবাণু-মুক্ত করার নাম **নির্বীজন (Sterilization)**। মানুষ প্রতিদিন যে খাদ্য গ্রহণ করে, তাহার অধিকাংশই জীবাণুর পীঠস্থান বলা যায়। কাজেই, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে এবং যথাযথভাবে খাদ্য সংরক্ষিত না রাখিলে, রোগ সৃষ্টি হইতে পারে। সেইজন্য, খাওয়ার আগে অধিকাংশ খাদ্য জীবাণু-মুক্ত করা প্রয়োজন। 100° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় সমস্ত জীবাণুর মৃত্যু হয়। ইহা ছাড়া, রোগজনক জীবাণুগুলি উচ্চ-চাপের মাধ্যমে 60° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় মরিয়া যায়। শেষোক্ত পদ্ধতিতে নির্বীজন করাকে **প্যাস্‌টুরাইজেশান (Pasteurization)** বলে। বোতলের দুধ এইভাবে নির্বীজন করা হয়।

জীবাণু জীব-জগতের যে পরিমাণে ক্ষতি করে, তাহার চেয়ে বেশি উপকার করে। **পচন (Decay)** এবিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর পর সমস্ত জীবের দেহ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং পচন শুরু হয়। পচনের ফলে জীবের গলিত দেহ হইতে ক্রমাগত কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হইতে থাকে। এইভাবে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বজায় থাকা ছাড়া, মাটিতে

খনিজ পদার্থ ও নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগ সংযোজিত হয় এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি হয়।

কতকগুলি জীবাণু বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে সরাসরি বিভিন্ন রকম নাইট্রোজেন যৌগে রূপান্তরিত করিতে পারে। ইহাদের **নাইট্রোজেন-স্থিতিকারী জীবাণু (Nitrogen fixing bacteria)** বলে। অ্যাজোটোব্যাক্টর (*Azotobactor*), ক্লসট্রিডিয়াম (*Clostridium*) প্রভৃতি জীবাণু এইভাবে বছরে একর-প্রতি 10 হইতে 20 কিলোগ্রাম পর্যন্ত নাইট্রোজেন মাটিতে যোগ করে। কতকগুলি জীবাণু, যেমন—রাইজোবিয়াম (*Rhizobium*) ইত্যাদি শিম্বি গোত্রের উদ্ভিদের মূলে অর্বুদ সৃষ্টি করিয়া, উহার মধ্যে বসবাস করে এবং বায়ুর নাইট্রোজেনকে নাইট্রোজেন যৌগে রূপান্তরিত করে। এইভাবে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ জীবাণুর সাহায্যে সহজে নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্যোপাদান পাইয়া থাকে। বিনিময়ে, জীবাণু উদ্ভিদের নিকট হইতে কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্য পায়।

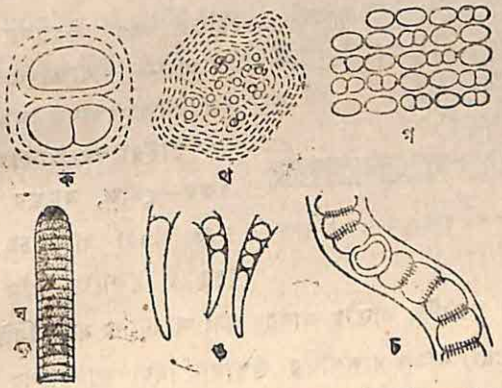
জীবাণুর ক্রিয়াকলাপের ফলে কতকগুলি প্রয়োজনীয় জৈব যৌগ তৈয়ারী হয়; ইহাদের মধ্যে অ্যাসেটিক অ্যাসিড, ইথাইল অ্যাল্‌কোহল, বিউটারিক অ্যাসিড (Buteric acid) উল্লেখযোগ্য। ল্যাক্‌টোব্যাসিলাস (*Lactobacillus*) নামক এক শ্রেণীর জীবাণুর সাহায্যে দুধ হইতে দই ও পনীর তৈয়ারী হয়। জীবাণুর সাহায্যে পাট ও শণ গাছ হইতে তন্তু নিষ্কাশন করা হয়। এইভাবে মানুষ জীবাণুর সাহায্যে নানাভাবে উপকৃত হইয়া থাকে।

নীল-হরিৎ শেওলা (Blue-green algae)

ইহারা এককোষী অথবা সূত্রবৎ (Filamentous) শেওলা-শ্রেণীর উদ্ভিদ হইলেও, জীবাণুর সঙ্গে ইহাদের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। কতকগুলি জলজ নীল-হরিৎ শেওলা উষ্ণ প্রস্রবণের প্রায় 60° হইতে 70° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বসবাস করে।

ইহাদের কোষের চারদিকে একটি সুগঠিত কোষ-প্রাকার থাকে (63নং চিত্র)। এই কোষ-প্রাকার আদর্শ উদ্ভিদ কোষ-প্রাকারের মতো সেলুলোজ দিয়া গঠিত। জীবাণুর মতো, ইহাদেরও কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না। কোষের মাঝখানে সাইটোপ্লাজ্‌মে একটি দানাদার অংশ থাকে। ঐ অংশটি নিউক্লিয়াসের

মতো কাজ করে। ইহাদের কোষে ক্লোরোফিলের পরিবর্তে **ফাইকোসায়া-নিন** (Phycocyanin) নামক একধরনের রঞ্জক থাকে। নীল-হরিৎ শেওলার কোষে প্লাসটিড থাকে না। রঞ্জক সাইটোপ্লাজমের পরিধি-বরাবর ক্রোমাটোফোর (Chromatophore) নামক একধরনের দানাদার বস্তুর মধ্যে থাকে।



63 নং চিত্র—ক. হইতে চ. কয়েক ধরনের নীল-হরিৎ শেওলা।

ইহাদের কোষে ফ্লাজেলা অনুপস্থিত। জীবাণুর মতো, ইহাদেরও কোষে মাইটোকনড্রিয়া অথবা গলজি বস্তু থাকে না।

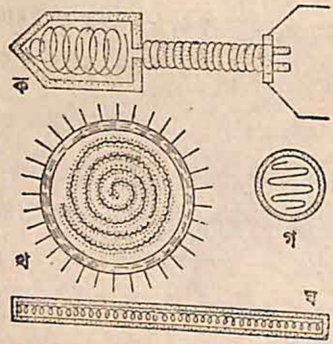
সমস্ত নীল-হরিৎ শেওলা স্বভোজী। ইহারা সালোকসংশ্লেষের সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে এবং প্রায় সকলেই সবাত শ্বসন করে।

ইহারা অযৌন পদ্ধতিতে বংশ-বৃদ্ধি করে। এই জনন প্রধানতঃ দ্বিভাজন দ্বারা হয়। ইহাদের কোষে কয়েক ধরনের অযৌন স্পোর, (Spores) উৎপন্ন হয়। স্পোরের সাহায্যেও ইহারা বংশ-বৃদ্ধি করে। অ্যানাবিনা (*Anabaena*), নস্টক (*Nostoc*) ইত্যাদি কয়েক ধরনের নীল-হরিৎ শেওলা নাইট্রোজেন-স্থিতি করিতে পারে।

ভাইরাস (Virus)

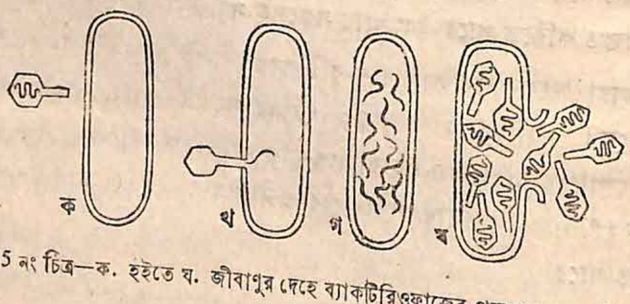
ভাইরাস এক বিশেষ ধরনের সূক্ষ্মদেহী বস্তু। ইহাদের আয়তন 0·01 হইতে 0·1 মাইক্রন। ইহারা জীব ও জড়ের মাঝামাঝি। জীবের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই ভাইরাসে অনুপস্থিত। যেমন, ইহাদের নিজস্ব কোনও বিপাক নাই এবং ইহ-

দের বৃদ্ধি হয় না। সমস্ত ভাইরাস, জীবাণু, প্রাণী অথবা উদ্ভিদ-দেহে পরজীবী-রূপে বাস করে। পোষকের দেহের বাহিরে ইহারা জড় পদার্থের মতো থাকে। শুধু পোষকের দেহে ইহারা বংশ-বৃদ্ধি করে। কাজেই, বংশ-বৃদ্ধির জন্য ইহাদের পরজীবিতার প্রয়োজন বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক ভাইরাসের পোষক নির্দিষ্ট হয়।



64 নং চিত্র—ক. হইতে ঘ. কয়েক রকম ভাইরাসের গঠন।

ভাইরাসের আকার প্রধানতঃ চার রকম—গোল, বাক্সের মতো, দণ্ডের মতো অথবা ব্যাঙাচির মতো (64 নং চিত্র)। কোষের গঠন খুবই সরল। একটি পাতলা প্রোটীন-জাতীয় আবরণ এবং আবরণের মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid) নামক বংশগতির উপাদান নিয়া ভাইরাসের কোষ গঠিত। ভাইরাসের কোষকে **নিউক্লিওক্যাপ্‌সিড (Nucleocapsid)** বলা হয়। পোষকের দেহে প্রবেশ করার পর, নিউক্লিওক্যাপ্‌সিড ফাটিয়া নিউক্লিক অ্যাসিড বাহির হইয়া আসে (65 নং চিত্র-খ) এবং পোষকের কোষের মধ্য ইহা ক্রমাগত বিভক্ত হইতে থাকে (65 নং চিত্র-গ)। বিভক্ত নিউক্লিক অ্যাসিড হইতে আবার নিউক্লিওক্যাপ্‌সিড তৈয়ারী হয় (65 নং চিত্র-ঘ)।



65 নং চিত্র—ক. হইতে ঘ. জীবাণুর দেহে ব্যাক্‌টিরিওফাজের প্রবেশ ও বংশ-বৃদ্ধি।

জীবাণুর দেহে যে সমস্ত ভাইরাস পরজীবী-রূপে থাকে, তাহাদের **ব্যাক্‌টিরিওফাজ (Bacteriophage)** বা **ফাজ (Phage)** বলে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা (Influenza), পোলিওমাইলেটিস (Poliomyletis) বা পোলিও (Polio), বসন্ত (Pox), জলাতঙ্ক (Rabies), পীত-জ্বর (Yellow fever) প্রভৃতি রোগ

ভাইরাসের দ্বারা ঘটে। টোবাকো মোজেইক ভাইরাস (Tobacco mosaic virus) উদ্ভিদ-দেহে উল্লেখযোগ্য ভাইরাস।

উল্লিখিত মাইক্রোব ছাড়া, **রিকেট্শী** (Rickettsiae) এবং **মাইকোপ্লাজ্মা** (Mycoplasma) নামের আরও দুই ধরনের মাইক্রোব দেখা যায়। জীবাণু অথবা নীল-হরিৎ শেওলার মতো, ইহাদেরও কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না। ইহাদের অধিকাংশই পরজীবী। একধরনের মাইকোপ্লাজ্মা নিউমোনিয়া (Pneumonia) রোগের কারণ।

ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা
(Practical Experience)

7

আগের পরিচ্ছদগুলিতে জীবনের বিভিন্ন ধর্মের বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। কয়েকটি সহজ পরীক্ষা ও নিরীক্ষার সাহায্যে জীবনের নানা ধর্ম সম্বন্ধে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সহজসাধ্য এইরকম কয়েকটি পরীক্ষা ও নিরীক্ষা নিচে বর্ণনা করা হইল।

উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন ফস্‌ফরাস এবং পটাশিয়ামের ভূমিকা
(Role of Nitrogen, Phosphorus aud Potassium in growth in plants)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খনিজ পদার্থের কথা বলা হইয়াছে। এইসব খনিজ পদার্থের অধিকাংশই উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যেমন, উদ্ভিদের সামগ্রিক বৃদ্ধির জন্য, বিশেষ করিয়া পত্রের বৃদ্ধির জন্য, নাইট্রোজেন অপরিহার্য—ইহা প্রোটীন, ক্লোরোফিল ও প্রোটোপ্লাজ্‌মের উপাদান। সেইজন্য, ইহার অভাবে পত্র হলুদ হইয়া যায়। ফস্‌ফরাস উদ্ভিদের পুষ্টিতে এবং মূল-তন্ত্র ও মৃদগত অঙ্গের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ইহার অভাবে মূলের স্বাভাকি বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তেমনি পটাশিয়াম কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটীন সংশ্লেষে এবং উদ্ভিদের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ইহার অভাবে কাণ্ড সরু হইয়া যায়, পত্র বর্ণহীন হয় এবং ক্রমেই শুকাইয়া যায়। একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে এই তিনটি মৌলিক পদার্থের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। এই পরীক্ষাটিকে **জল-অনুশীলন পরীক্ষা** (Water culture experiment) বলা হয়। নিচে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইল।

উপকরণ (Requirements)—একই ধরনের চারটি বোতল, কালো কাগজ, দুইটি (একটি মাঝখানে, অন্যটি পাশে) ছিদ্রযুক্ত চারটি রবারের ছিপি, কাচের বাঁকা নল, মূলসহ চারটি সতেজ ধানের চারাগাছ এবং পরের পৃষ্ঠায় লিখিত চার রকম অনুশীলন-দ্রবণ।

অনুশীলন-দ্রবণ তৈয়ারি করা (Preparation of culture solution)—উদ্ভিদের খাদ্য-প্রস্তুতের জন্য যে সব মৌলিক পদার্থ দরকার, তাহাদের লবণ পাতিত জলে পরিমাণমতো দ্রবীভূত করিয়া **সাধারণ অনুশীলন-দ্রবণ** (Normal culture solution) তৈয়ারি করা হয়। এই পরীক্ষার জন্য সাধারণ অনুশীলন-দ্রবণ, এবং সাধারণ অনুশীলন-দ্রবণের উপাদান হইতে যথাক্রমে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস এবং পটাশিয়াম বাদ দিয়া তিন রকম দ্রবণ, অর্থাৎ মোট চার রকম অনুশীলন-দ্রবণ তৈয়ারি করিতে হয়। নিচে এই চার রকম (সাধারণ ও পরিবর্তিত) অনুশীলন-দ্রবণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন লবণের যথাযথ পরিমাণ দেওয়া হইল। প্রত্যেক বার, এক লিটার পাতিত জলে দ্রবণ তৈয়ারি করিতে হইবে।

সাধারণ অনুশীলন-দ্রবণ—

পটাশিয়াম নাইট্রেট [KNO_3]—0·2 গ্রাম,

পটাশিয়াম ক্লোরাইড [KCl]—0·2 গ্রাম,

পটাশিয়াম ডাই-হাইড্রোজেন ফস্‌ফেট [KH_2PO_4]—0·2 গ্রাম,

ক্যালশিয়াম নাইট্রেট [$Ca(NO_3)_2$]—0·8 গ্রাম,

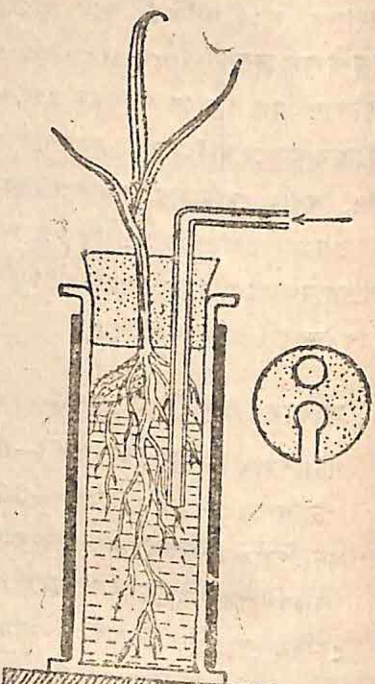
ফেরিক ক্লোরাইড [$FeCl_3$]—সামান্য।

নাইট্রোজেন-বিহীন অনুশীলন-দ্রবণ—সাধারণ অনুশীলন-দ্রবণের উপাদান হইতে নাইট্রেট লবণ বাদ দিয়া, অর্থাৎ পটাশিয়াম নাইট্রেটের পরিবর্তে সম-পরিমাণ পটাসিয়াম সাল্‌ফেট [K_2SO_4], এবং ক্যাল্‌শিয়াম নাইট্রেটের পরিবর্তে 0·2 গ্রাম ক্যাল্‌সিয়াম ক্লোরাইড [$CaCl_2$] নিয়া দ্রবণ তৈয়ারি করিতে হইবে।

ফস্‌ফরাস-বিহীন অনুশীলন-দ্রবণ—সাধারণ অনুশীলন-দ্রবণের উপাদান হইতে ফস্‌ফেট লবণ অর্থাৎ পটাশিয়াম ডাই-হাইড্রোজেন ফস্‌ফেট বাদ দিয়া দ্রবণ তৈয়ারি করিতে হইবে।

পটাশিয়াম-বিহীন অনুশীলন-দ্রবণ—সাধারণ অনুশীলন-দ্রবণের উপাদান হইতে সমস্ত পটাশিয়াম-ঘটিত লবণ, অর্থাৎ পটাশিয়াম নাইট্রেট, পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং পটাশিয়াম ডাই-হাইড্রোজেন ফস্‌ফেট [NaH_2PO_4] নিয়া দ্রবণ তৈয়ারি করিতে হইবে।

পরীক্ষা (Experiment) : বোতলগুলি কালো কাগজ দিয়া ভালভাবে ঢাকিয়া, লাল পেন্‌সিলের সাহায্যে বোতলগুলিকে ক্রমানুসারে 1 হইতে 4 পর্যন্ত চিহ্নিত করিতে হইবে। ইহার পর, 1 হইতে 4 নং বোতল যথাক্রমে সাধারণ অনুশীলন-দ্রবণ, নাইট্রোজেন-বিহীন দ্রবণ, ফস্‌ফরাস-বিহীন দ্রবণ, পটাশিয়াম-বিহীন দ্রবণ দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে এবং বোতলগুলি রবারের ছিপি দিয়া ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া, ছিপির মাঝখানের ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটি করিয়া ধানের সতেজ চারাগাছের মূল প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। প্রতিটি বোতলে চারার মূল যাহাতে দ্রবণে ভালভাবে ডুবিয়া থাকে, সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ছিপির অন্য ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটি করিয়া কাচের বাঁকা নল প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে দ্রবণের মধ্যে বায়ু-চলাচল অব্যাহত থাকে। এই অবস্থায়, বোতলগুলিকে রৌদ্র আসে, এমন জায়গায় পনেরো দিন রাখিয়া দিতে হইবে।



66 নং চিত্র—জল-অনুশীলন পরীক্ষা দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস এবং পটাশিয়ামের ভূমিকা-নির্ণয়
বাঁয়ে—পরীক্ষার বোতলের দীর্ঘচ্ছেদ
ডাইনে—ছিপির পৃষ্ঠ-দৃশ্য।

নিরীক্ষা (Observation) : পনেরো দিন পরে, চারাগুলিকে ভালো করিয়া পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে, কেবল 1 নং বোতলের চারাগাছটি স্বাভাবিকভাবে বাড়িয়াছে ; বাকী বোতলগুলিতে চারাগাছগুলির বৃদ্ধি কোনও-না-কোনও-রূপে ব্যাহত হইয়াছে : যেমন—2 নং বোতলের গাছটির বৃদ্ধি সম্পূর্ণ-রূপে ব্যাহত হইয়াছে। কাণ্ড দুর্বল ও পত্রগুলি সরু সরু হইয়া গিয়াছে এবং পাতার রঙ হলুদ হইয়া গিয়াছে। 3 নং বোতলের চারাগাছটিরও বৃদ্ধি স্বাভাবিক নয়—ইহার মূলগুলি আদৌ বাড়ে নাই। 4 নং বোতলের চারাগাছটির কাণ্ড সরু হইয়া গিয়াছে, পত্রগুলি বর্ণহীন হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে।

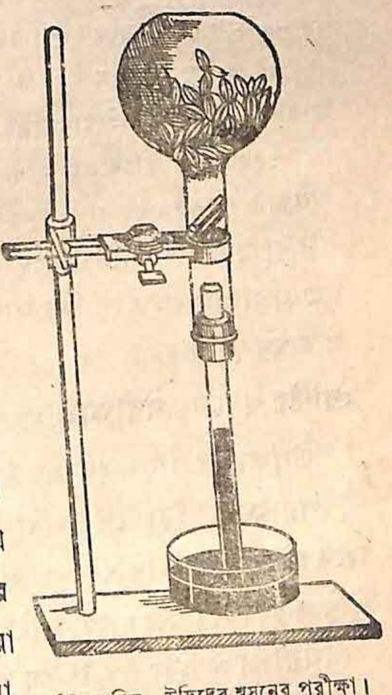
সিদ্ধান্ত (Inference) : 1 নং বোতলে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থগুলি থাকায়, ঐ বোতলের চারাগাছটি স্বাভাবিক-ভাবে বাড়িয়াছে। অন্য বোতলগুলিতে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস এবং পটাশিয়াম —উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে অপরিহার্য এই তিনটি মৌলিক পদার্থের কোনও একটি অনুপস্থিত থাকায়, ঐ বোতলগুলির গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হইয়াছে।

শ্বসনের পরীক্ষা (Experiments on respiration)

প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে, শ্বসনের জন্য অক্সিজেন ব্যবহৃত হয় এবং শ্বসনের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বসনে যে অক্সিজেন অপরিহার্য এবং শ্বসনের দ্বারা যে কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয়, তাহা নিচে বর্ণিত দুইটি পরীক্ষায় সাহায্যে সহজেই বোঝা যায়।

উদ্ভিদের শ্বসনের পরীক্ষা (Experiment on respiration in plants)

উপকরণ : একটি করিয়া দীর্ঘগ্রীব কুপী (Long-necked flask), ক্ল্যাম্প্‌ সহ স্ট্যাণ্ড (Clamp and stand), ছিদ্রযুক্ত ছিপি, দুই-মুখ-খোলা সরু কাচের নল, কাচের পাত্র, এবং কিছু পরিমাণ পারদ, তুলা, অল্প কয়েকটি কষ্টিক পটাশের দণ্ড (Caustic potash sticks) এবং সতেজ সূর্যমুখী ফুল।



67 নং চিত্র—উদ্ভিদের শ্বসনের পরীক্ষা।

পরীক্ষা : সূর্যমুখী ফুলের সবুজ মঞ্জরীপত্র ছিঁড়িয়া বাদ দিয়া বাকী অংশ জল দিয়া ভিজাইয়া কুপীর মধ্যে রাখিয়া দিতে হইবে। একটি অথবা দুইটি কষ্টিক পটাশের দণ্ড কুপীর মধ্যে রাখিয়া, কুপীর গলায় খানিকটা তুলা প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। ইহার পর কুপীর মুখ ছিপি দিয়া বন্ধ করিয়া, ছিপির ছিদ্রের মধ্য দিয়া কাচের নলটি প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। পাত্রে কিছুটা পারদ ঢালিয়া, কুপীটিকে পারদের উপর উপুড় করিয়া স্ট্যাণ্ডের ক্ল্যাম্পের সঙ্গে খাড়াভাবে আট্‌কাইয়া দিতে হইবে (67 নং চিত্রের

মতো)। কুপীটি উপুড় করিলে কষ্টিক পটাশের দণ্ডগুলি তূলার উপরে চলিয়া আসে। কাচনলের নিচের দিক যাহাতে কাচের পাত্রের তলা স্পর্শ না করে, অথচ পারদের মধ্যে ডুবিয়া থাকে—সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যন্ত্রটিকে এই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিতে হইবে।

নিরীক্ষা ঃ কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা যাইবে, পাত্রের পারদ কাচনলের মধ্যে উঠিয়া, কাচনল এবং কুপীর মোট আয়তনের প্রায় একের পাঁচ অংশ অধিকার করিয়াছে।

সিদ্ধান্ত ঃ শ্বসনের প্রয়োজনে, ফুল কুপীর ভিতরের অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং শ্বসনের ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। কষ্টিক পটাশ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে বলিয়া, কুপী ও নলের মধ্যে আংশিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এই শূন্যতা পূর্ণ করার জন্য পারদ নলের মধ্যে উঠিয়া আসে। সুতরাং, এই পরীক্ষায় সহজে প্রমাণিত হয়—উদ্ভিদের শ্বসনের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হয়। বায়ুর একের পাঁচ ভাগ অক্সিজেন। উপরের পরীক্ষায় কুপী এবং নলের আয়তনের একের পাঁচ অংশ পারদপূর্ণ হওয়ায়, শ্বসনের ফলে যে অক্সিজেন শোষিত হয়, তাহাও পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়।

এই পরীক্ষার শেষে একটি বাঁকা পিপেট (Pipette)-এর সাহায্যে অল্প ক্ষারীয় পটাশিয়াম পাইরোগ্যালেট দ্রবণ (Alkaline potassium pyrogallate solution) কাচনলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার পরও পারদস্তম্ভের উচ্চতার পরিবর্তন হয় না। কুপীর মধ্যে অক্সিজেন থাকিলে, উহা ক্ষারীয় পটাশিয়াম পাইরোগ্যালেট দ্রবণ দ্বারা শোষিত হইত *; ফলে পারদস্তম্ভের উচ্চতা বাড়িয়া যাইত। কিন্তু তাহা না হওয়ায়, প্রমাণিত হয় যে, শ্বসনে বায়ুর অক্সিজেন গৃহীত হয়।

প্রাণীর শ্বসনের পরীক্ষা (Experiment on respiration in animals)

উপকরণ ঃ ঢাক্‌না-যুক্ত একটি কাচের শিশি ও একটি জীবন্ত নেংটি ইঁদুর।

পরীক্ষা ঃ ইঁদুরটিকে শিশির মধ্যে রাখিয়া ঢাক্‌নাটিকে আঁটিয়া লাগাইয়া দিতে হইবে, যাহাতে শিশির মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। এই অবস্থায় শিশি ও ইঁদুরটিকে কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিতে হইবে।

নিরীক্ষা ঃ ইঁদুরটিকে শিশির মধ্যে রাখিয়া দেওয়ার ঠিক পরেই উহাকে স্বাভাবিকভাবে নড়াচড়া করিতে দেখা যায়। কিন্তু ক্রমেই উহা নিস্তেজ হইয়া

* ক্ষারীয় পটাশিয়াম পাইরোগ্যালেট দ্রবণ অক্সিজেন গ্যাস শোষণ করে।

পড়িতে থাকে এবং অবশেষে মরিয়া যায়। তখন, শিশিটির ঢাকনা অল্প ফাঁক করিয়া উহার মধ্যে একটি জলন্ত দিয়াশালাই-কাঠি প্রবেশ করাইলে, উহা সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়া যায়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রথমে শিশির মধ্যস্থ বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্যে স্বাভাবিক শ্বাস-কর্ম করিতে পারায়, ইঁদুরটি সহজভাবে নড়াচড়া করিতে থাকে। কিন্তু ক্রমেই অক্সিজেনের অভাবের ফলে শ্বাসকর্মের ব্যাঘাত ঘটায়, উহা নিস্তেজ হইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত, অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসকর্ম করিতে না পারিয়া, মরিয়া যায়। শিশির মধ্যে ইঁদুরের শ্বসনের ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকায়, উহার মধ্যে জলন্ত দিয়াশলাই-কাঠি প্রবেশ করাইয়া দিলে, নিভিয়া যায়। কারণ, কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাধ্যমে দহন সম্ভব নয়।

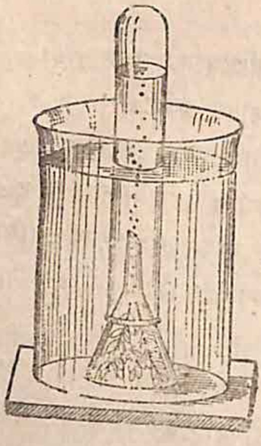
বেশিক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিলে যে শ্বাসকষ্ট (দম বন্ধ) হয়, তাহার কারণ— এই সময় শ্বাসকর্মে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। মানুষের শ্বসনের ফলেও যে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়, তাহা সহজে প্রমাণ করা যায়। একটি কাচপাত্রে কিছুটা পরিষ্কার চুনের জল নিয়া উহার উপরে কিছুক্ষণ জোরে জোরে শ্বাসত্যাগ করিলে চুনের জলকে ঘোলা হইয়া যাইতে দেখা যায় এবং উহার উপরে একটি পাতলা ও সাদা স্তর সৃষ্টি হয়। চুনের জল, প্রকৃতপক্ষে, ক্যাল্‌শিয়াম হাইড্রক্সাইড [Calcium hydroxide, $Ca(OH)_8$]-এর দ্রবণ। শ্বাসকর্মের ফলে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড ক্যাল্‌শিয়াম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করায়, জলে অদ্রাব্য ক্যাল্‌শিয়াম কার্বোনেট [Calcium carbonate, $CaCO_2$]-এর অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হয়। ফলে, চুনের জলের এইরকম পরিবর্তন হয়।

সালোকসংশ্লেষের পরীক্ষা (Experiment on photosynthesis)

সালোকসংশ্লেষ কেবল সূর্যালোকের উপস্থিতিতে হয় এবং এই সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড গৃহীত হয় ও অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয়। নিচের সহজ পরীক্ষাটির সাহায্যে সালোকসংশ্লেষে যে অক্সিজেন নির্গত হয়, এবং ইহা যে কেবল সূর্যালোকে হয়, তাহা প্রমাণ করা যায়।

উপকরণ ঃ একটি করিয়া বীকার (Beaker) ফানেল (Funnel), পরীক্ষা-নল (Test-tube), বাঁকা কাচনল, এবং কয়েকটি হাইড্রিলা (*Hydrilla*) নামক জলজ উদ্ভিদ, কিছু পরিমাণ জল, ক্ষারীয় পটাশিয়াম পাইরোগ্যালেট দ্রবণ এবং সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট (Sodium bicarbonate)।

পরীক্ষা : বীকারটি তিনের-চার অংশ জলপূর্ণ করিয়া, উহার মধ্যে কয়েকটি হাইড্রিলা রাখিয়া দিতে হইবে। ইহার পর, জলে অল্প সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট দিয়া ফানেলটি উপুড় করিয়া জলজ উদ্ভিদ-গুলিকে এমনভাবে ঢাকিয়া দিতে হইবে, যাহাতে উহাদের কাণ্ড ফানেলের ডাঁটির দিকে থাকে। পরীক্ষা-নলটিকে জলপূর্ণ করিয়া ফানেলের ডাঁটির উপর উপুড় করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। এই অবস্থায় বীকারটিকে কিছুক্ষণ সূর্যালোকে রাখিতে হইবে।



68 নং চিত্র—সালোক-সংশ্লেষের পরীক্ষা।

নিরীক্ষা : কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে, উদ্ভিদগুলি হইতে বুদ্‌বুদ বাহির হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া পরীক্ষা-নলের মধ্যে জমা হইতেছে এবং পরীক্ষা-নলের জল নিচে নামিয়া যাইতেছে। বীকারটি অন্ধকারে রাখিয়া দিলে বুদ্‌বুদ বাহির হওয়া বন্ধ হইয়া যায়।

সিদ্ধান্ত : সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষ নির্গত অক্সিজেন গ্যাস বুদ্‌বুদ আকারে বাহির হইয়া পরীক্ষা-নলে জমা হয়। একটি বাঁকা কাচ-নলের সাহায্যে পরীক্ষা-নলের মধ্যে অল্প ক্ষারীয় পটাশিয়াম পাইরোগ্যালেট দ্রবণ প্রবেশ করাইয়া দিলে, পরীক্ষা-নলটি আবার ভর্তি হইয়া যায়।

সালোকসংশ্লেষে নির্গত অক্সিজেন, ক্ষারীয় পটাশিয়াম পাইরোগ্যালেট দ্রবণ দ্বারা শোষিত হওয়ায় এইরকম হয়। আবার, আলোক না থাকিলে সালোক-সংশ্লেষ হয় না বলিয়া, বীকারটিকে অন্ধকারে রাখিয়া দিলে সালোকসংশ্লেষ বন্ধ হইয়া যায় ; ফলে, বুদ্‌বুদ বাহির হওয়াও বন্ধ হয়। কাজেই, এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় সালোকসংশ্লেষ সূর্যালোকের উপস্থিতিতেই হয় এবং সালোক-সংশ্লেষের ফলে উদ্ভিদ অক্সিজেন ত্যাগ করে।

আরসোলার পৌষ্টিক নালী (Alimentary canal of cockroach)

আরসোলার পৌষ্টিক নালী ব্যবচ্ছেদ করিয়া ইহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

ব্যবচ্ছেদ-প্রণালী (Method of dissection)— একটি জার(Jar)-এর মধ্যে একটি আরসোলা রাখিয়া, কিছুটা তুলা ক্লোরোফোরম (Chloroform)-এ

ভিজাইয়া উহার মধ্যে দিয়া, জারের মুখ বন্ধ করিয়া দিলে, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আরসোলাটি মরিয়া যায়। কাঁচির সাহায্যে মৃত আরসোলাটির ডানা ও পাগুলি কাটিয়া, ব্যবচ্ছেদ করার জন্য মোম-যুক্ত বিশেষ ধরনের ট্রে (Tray)-র উপর উপুড় করিয়া রাখিয়া, দুই পাশে এবং পিছনের দিকে আল্‌পিন গাঁথিয়া, আরসোলাটিকে ট্রের মোমের সঙ্গে আট্‌কাইয়া দিতে হইবে। ট্রে-তে কিছুটা জল ঢালিয়া, আরসোলাটিকে জলে ডুবাইয়া দিতে হইবে। ইহার পর (69 নং চিত্রের মতো) দেহের দুই পাশ-বরাবর ছোট কাঁচি চালাইয়া উদর, পশ্চাৎ ও মধ্য-বক্ষের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত কৃত্তিকাবরণের ছোট ছোট অংশগুলিকে কাটিতে হইবে। এইবার ক্রমান্বয়ে অগ্র-বক্ষের ঢালের মতো কৃত্তিকাবরণ, গ্রীবার কৃত্তিকাবরণ এবং মস্তকের কালো ও শক্ত কৃত্তিকাবরণ কাটার পর ছোট চিমটা এবং হাতল-যুক্ত সূচের সাহায্যে সমস্ত কৃত্তিকাবরণ তুলিয়া ফেলিলে, এবং সাদা সাদা শ্বাসনালী ও মেদপুঞ্জ সাবধানে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করিলে, পৌষ্টিক নালী দেখা যাইবে। মস্তকের ভিতরে অবস্থিত মস্তিষ্কটিকে ছোট কাঁচি ও চিমটার সাহায্যে বাদ দিয়া দিলে দিলে, পৌষ্টিক নালীর প্রথম অংশ দেখা যায়। ইহার পর বাঁকা সূচ ও ছোট কাঁচির সাহায্যে অন্ননালীর প্রাকার হইতে লালাযন্ত্রটিকে সাবধানে ছাড়াইয়া তুলিয়া ফেলার পর, সাবধানে কাটিয়া বাদ দিতে হইবে। সবশেষে, সমস্ত পৌষ্টিক নালীর চারপাশ তুলি, চিমটা ও ছোট কাঁচির সাহায্যে ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া, পৌষ্টিক নালীর প্যাচানো অংশটি সাবধানে ছাড়াইয়া, সোজা করিয়া, আল্‌পিন দিয়া বাঁদিকে আট্‌কাইয়া দিতে হইবে।

পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশ (Different parts of the alimentary canal)—আরসোলার পৌষ্টিক নালী দেহের অগ্রভাগে অবস্থিত মুখ হইতে শুরু করিয়া দেহের পশ্চাৎ-ভাগে অবস্থিত পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত নলের মতো গঠন-বিশেষ—ইহার কোনও অংশ সরু, কোনও অংশ মোটা, কিছু অংশ সোজা, কিছু অংশ প্যাচানো। যেমন—

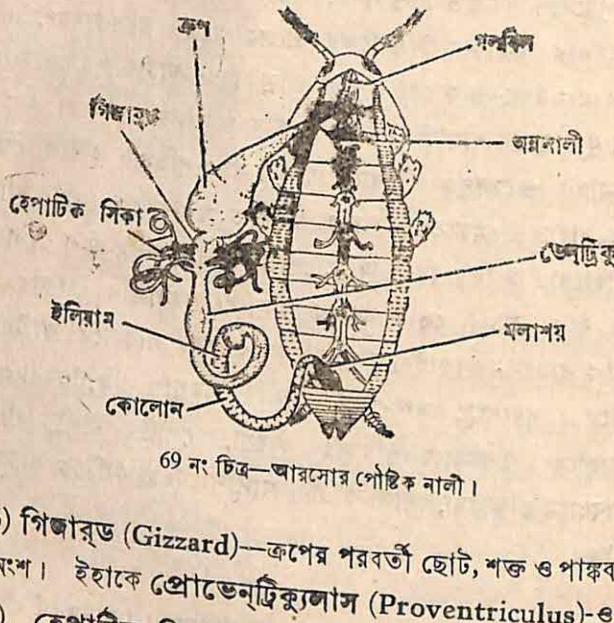
(1) **মুখ (Mouth)**—ইহা মস্তকের অগ্র-ভাগে মুখোপাঙ্গগুলি (Mouth parts) দ্বারা বেষ্টিত এবং উহাদের গোড়ায় অবস্থিত।

(2) **মুখ-বিবর (Buccal cavity)**—ইহা মুখের ঠিক পরের অংশ এবং আয়তনে খুব ছোট।

(3) **গলবিল** (**Pharynx**)—মুখ-বিবরের পরে অবস্থিত সরু নলের মতো অংশ। ইহা মস্তিষ্কের তলদেশ দিয়া দেহের পিছনের দিকে চলিয়া যায়।

(4) **অন্ননালী** (**Oesophagus**)—গলবিলের পরে অবস্থিত সরু ও লম্বা নলের মতো অংশ।

(5) **ক্রপ** (**Crop**)—অন্ননালীর পরে অবস্থিত পৌষ্টিক নালীর এই অংশ বক্ষের শেষভাগ হইতে উদরের প্রথমভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ক্রমশঃ মোটা হইয়া থলির মতো আকার ধারণ করে।



69 নং চিত্র—আরসোর পৌষ্টিক নালী।

(6) **গিজার্ড** (**Gizzard**)—ক্রপের পরবর্তী ছোট, শক্ত ও পাকব (Conical) অংশ। ইহাকে **প্রোভেন্ট্রিক্যুলাস** (**Proventriculus**)-ও বলে।

(7) **হেপাটিক সিকা** (**Hepatic caeca**)—গিজার্ড এবং পরবর্তী অংশের সংযোগ-স্থলে অবস্থিত 8টি সরু, বদ্ধ নলের মতো অংশ। ইহাদের হেপাটিক সিকা বা **গ্যাস্ট্রিক সিকা** (**Gastric caeca**) বলে।

(8) **ভেন্ট্রিক্যুলাস** (**Ventriculus**—গিজার্ডের পরে অবস্থিত প্রায় সম-ব্যাসযুক্ত প্যাঁচানো নলের মতো অংশ।

(9) **ইলিয়াম** (**Ileum**)—ভেনট্রিক্যুলাসের পরের অংশ এবং ভেনট্রিক্যুলাসের চেয়ে অল্প ছোট, সরু নলের মতো।

(10) **কোলোন** (**Colon**)—ইলিয়ামের পরের অংশ। ইলিয়ামের সঙ্গে কোলোনের সংযোগ-স্থলের প্রাকারে একটি খাঁজ থাকে।

(11) **মলাশয় বা রেক্টাম (Rectum)**—পৌষ্টিক নালীর শেষ অংশ। কোলোনের সঙ্গে ইহার সংযোগ-স্থলে পৌষ্টিক নালীর প্রাকারে একটি খাঁজ দেখা যায়। ইহার মধ্যভাগ মোটা।

(12) **পায়ু (Anus)**—মলাশয় শেষ দেহ-খণ্ডকের অঙ্কদেশে অবস্থিত একটি ছিদ্রের সঙ্গে যুক্ত। এই ছিদ্রটি পায়ু।

আরসোলার পৌষ্টিক নালীকে সচরাচর (ক) অগ্র-পৌষ্টিক নালী (Fore-gut), (ঘ) মধ্য-পৌষ্টিক নালী (Mid-gut) এবং (গ) পশ্চাৎ-পৌষ্টিক নালী (Hind-gut)—এই তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। 1 নং হইতে 6 নং অংশ পর্যন্ত অগ্র-পৌষ্টিক নালীর 7 নং ও 8 নং অংশ মধ্য-পৌষ্টিক নালীর এবং 9 নং হইতে 12 নং পর্যন্ত পশ্চাৎ-পৌষ্টিক নালীর অন্তর্গত।

কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্র (Digestive system of toad)

কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য ইহার ব্যবচ্ছেদ করা প্রয়োজন।

ব্যবচ্ছেদ-প্রণালী—আরসোলার মতো করিয়া ক্লোরোফর্মের সাহায্যে একটি কুনো ব্যাঙকে মারিয়া, ট্রে-র উপর চিৎ করিয়া রাখিয়া চারটি আলপিনের সাহায্যে উহার চারটি পা-কে টান টান করিয়া মোমের সঙ্গে গাঁথিয়া দিতে হইবে। ট্রে-তে কিছুটা জল ঢালিয়া ব্যাঙটিকে জলে ডুবাইয়া দিতে হইবে। ইহার পর বড় চিমটা ও বড় কাঁচির সাহায্যে অঙ্কীয় মধ্যরেখার চর্মে একটি ছোট ছিদ্র করিয়া, ঐ ছিদ্রের মধ্যে কাঁচির ভোঁতা দিকটা প্রবেশ করাইয়া, সমগ্র দেহের অঙ্কীয় মধ্যরেখা বরাবর চর্মকে লম্বালম্বি চিরিয়া ফেলিতে হইবে। একই পদ্ধতিতে অগ্র-পদ ও পশ্চাৎ-পদের চর্ম মধ্যরেখা-বরাবর চিরিয়া ফেলার পর, চর্মের কাটা অংশগুলি বড় চিমটা দিয়া ধরিয়া, স্ক্যালপেল (Scalpel)-এর ভোঁতা দিক দিয়া পেশী হইতে ছাড়াইয়া নিয়া দেহের দুই পাশে টান-টান করিয়া ট্রে-র মোমের সঙ্গে আলপিনের সাহায্যে আটকাইয়া দিতে হইবে। পেশী-স্তরের অঙ্কীয় মধ্যরেখা-বরাবর একটি কালো দাগ দেখা যায়। আগের মতো পদ্ধতিতে, কাঁচির ভোঁতা দিকটা দেহ-গহ্বরে প্রবেশ করাইয়া, ঐ কালো দাগের দুই পাশ-বরাবর পেশী-স্তর কাটিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে উরশ্চক্র দ্বিখণ্ডিত করিতে হইবে। এইবার কাটা পেশীর মধ্যরেখা-বরাবর অবস্থিত একটি শিরাকে সাবধানে ছাড়াইয়া নেওয়ার পর, ঐ পেশীর টুকরাকে কাটিয়া বাদ দিতে

হইবে। এখন দেহের দুই পাশের দুইটি পেশী-স্তরকেও চর্মের মতো টান-টান করিয়া ট্রে-র সঙ্গে আট্‌কাইয়া দিতে হইবে।

উপরে বর্ণিত উপায়ে দেহ-গহ্বর উন্মুক্ত করার পর কেবল পৌষ্টিক নালী, যকৃৎ; অগ্ন্যাশয় ও পিত্তাশয় রাখিয়া, দেহ-গহ্বরের অন্যান্য সমস্ত অবাঞ্ছিত যন্ত্র, যেমন —জনন-যন্ত্র ও উহাদের নালী, মূত্রাশয়, বৃক্ক, প্লীহা, ফুস্ফুস, হৃৎপিণ্ড, রক্তবাহ প্রভৃতি কাটিয়া বাদ দিতে হইবে। ডিওডেনাম ও পাকস্থলীর গায়ে যে ধারণ-ঝিল্লী লাগিয়া থাকে, তাহা ছাড়া অন্ত্রের অন্যান্য অংশের গায়ে যে ধারণ-ঝিল্লী থাকে তাহা সাবধানে ছিঁড়িয়া, অন্ত্রের প্যাঁচ খুলিয়া দিতে হইবে। অবশেষে, স্ক্যাল্‌পেল দিয়া শ্রেণীচক্র দুই ভাবে কাটিয়া ফেলিলে, অবসারণী উন্মুক্ত হইবে।

পৌষ্টিক তন্ত্র—কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্র (ক) পৌষ্টিক নালী এবং (খ) দুইটি পরিপাক-গ্রন্থি লইয়া গঠিত।

পৌষ্টিক নালী—ইহাতে নিম্নলিখিত অংশগুলি থাকে :—

(1) **মুখ**—মস্তকের অগ্র-ভাগে অবস্থিত, খুব বড় এবং উপর-নিচে দুইটি দন্তহীন চোয়াল দ্বারা বেষ্টিত।

(2) **মুখ-বিবর**—মুখের পরবর্তী অংশ খুব প্রশস্ত। ইহার মেঝেয় নাশপাতি-আকার জিহ্বা থাকে। ইহা সামনের প্রান্তে যুক্ত।

(3) **গলবিল**—মুখ-বিবরের শেষভাগে অবস্থিত অপ্রশস্ত অংশ।

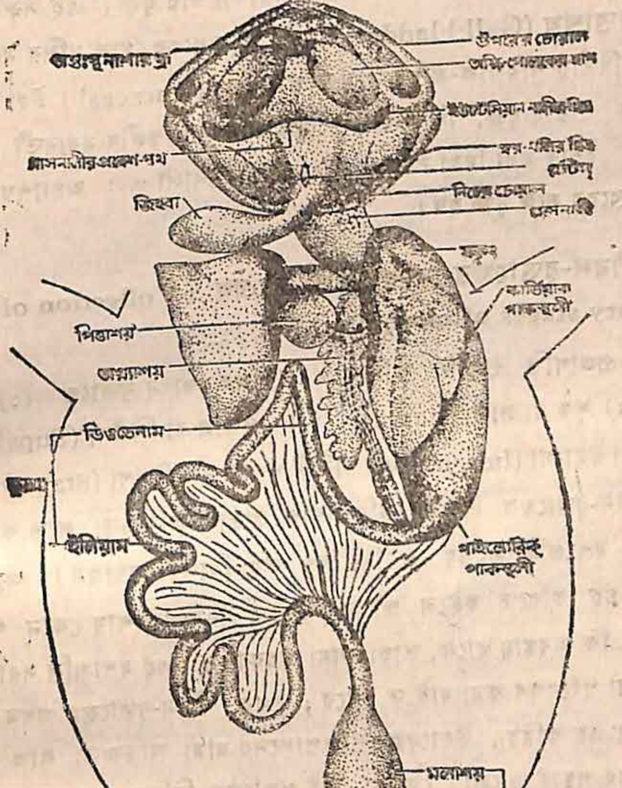
(4) **অন্ননালী** বা **গ্রাসনালী**—গলবিলের পরবর্তী মোটা ও বেঁটে নলের মতো অংশ।

(5) **পাকস্থলী (Stomach)**—অন্ননালীর পরে অবস্থিত থলির মতো অংশ। ইহার প্রথম অংশ চওড়া এবং **কার্ডিয়াক পাকস্থলী** (Cardiac stomach) নামে পরিচিত। পরের অংশ সরু। ইহাকে **পাইলোরিক পাকস্থলী (Pyloric stomach)** বলে।

(6) **ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine)**—পাকস্থলীর পরে অবস্থিত, সরু, লম্বা ও প্যাঁচানো নলের মতো অংশ। ইহার প্রথম অংশ পাকস্থলীর সঙ্গে প্রায় সমান্তরালে থাকিয়া, ইংরেজী 'U'-এর মতো আকার ধারণ করে। ইহাকে গ্রহণী বা **ডিওডেনাম (Duodenum)** বলা হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ অংশ প্যাঁচানো। ইহাকে **নিম্ন-ক্ষুদ্রান্ত্র** বা **ইলিয়াম (Ileum)** বলে।

(7) **বৃহদন্ত্র (Large intestine)**—ক্ষুদ্রান্ত্রের পরবর্তী মোটা নলের

মতো অংশ। ইহার প্রথম অংশ খুব মোটা এবং **মলাশয়** (Rectum) নামে পরিচিত। বৃহদন্ত্রের শেষ অংশ সরু; ইহাকে **অবসারণী** (Cloaca) বলে।



70 নং চিত্র—কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্র।

(8) **অবসারণী-ছিদ্র** (Cloacal aperture)—অবসারণীর শেষ-প্রান্তে অবস্থিত ছিদ্র-বিশেষ।

পরিপাক-গ্রন্থি—পরিপাক-গ্রন্থি দুইটির একটির নাম যকৃৎ (Liver)।

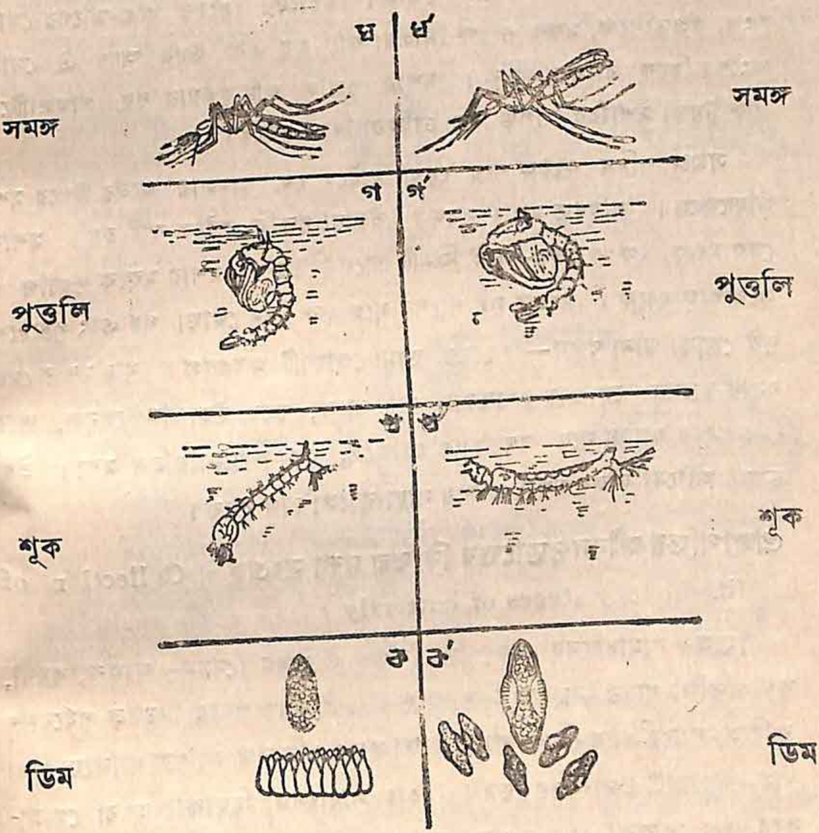
ইহা গাঢ় বাদামী রঙের, পাকস্থলীর কাছে অবস্থিত এবং দুইটি প্রধান খণ্ডে বিভক্ত। বাঁদিকের খণ্ডটি বড়। ইহার বাহিরের দিকে একটি খাঁজ থাকে। যকৃতের প্রধান খণ্ড দুইটি সরু একটি অংশ দ্বারা পরস্পর যুক্ত। এই সরু অংশের উপরে **পিত্তাশয় (Gall-bladder)** নামের সবুজ রঙের গোল থলির মতো বস্তু থাকে। দ্বিতীয় পরিপাক-গ্রন্থির নাম **অগ্ন্যাশয়** (Pancreas)। ইহা লম্বাটে, অনিয়মিত পরিধি-যুক্ত, ঘি রঙের এবং গ্রহণী ও পাকস্থলীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। ইহার মধ্য দিয়া সংযুক্ত সাধারণ পিত্তনালী এবং অগ্ন্যাশয় নালী গ্রহণীর গহ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়।

মশার জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশা সংগ্রহ (Collection of life-history stages of mosquito)

মশা, প্রজাপতি প্রভৃতি অধিকাংশ পতঙ্গের জীবন-বৃত্তান্তে (১) ডিম (Egg), (২) শূক বা লার্ভা (Larva), (৩) পুত্তলি বা পিউপা (Pupa) এবং (৪) সমঙ্গ বা ইমাগো (Imago)—এই চারিটি পৃথক ও স্পষ্ট দশা (Stages) দেখা যায়। জীবন-বৃত্তান্তের এই দশাগুলি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে, এই দশাগুলি সংগ্রহ ও নিরীক্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন। আবার, এইগুলি সংগ্রহ করিতে হইলে জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশায় কোন্ পতঙ্গ কোথায় এবং কি অবস্থায় থাকে, তাহা জানা দরকার। এই দশাগুলি সরাসরি সংগ্রহ করিয়া পর্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে ; অথবা, জীবন-বৃত্তান্তের প্রথম দশা অর্থাৎ ডিম সংগ্রহ করিয়া, উহাদের প্রতিপালনের দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। শেষের পন্থাই ভালো ; কেননা, এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন দশার সক্রিয়তা এবং ক্রমিক পরিবর্তন ও পরিণতি পর্যবেক্ষণ করা যায়।

ডিম—পশ্চিমবঙ্গে সচরাচর অ্যানোফিলিস (*Anopheles*) ও কিউলেক্স (*Culex*)—এই দুই ধরনের মশা বেশি দেখা যায়। মশারা জলে ডিম পাড়ে। কাজেই, ইহাদের ডিম সংগ্রহ করিতে হইলে একটি গামলা বা ঐরকম কোনও পাত্রে লতাপাতা রাখিয়া, পাত্রটিকে জলপূর্ণ করিয়া, রৌদ্র-আসে-না এমন কোনও খোলা জায়গায় কয়েকদিন রাখিয়া দিতে হইবে। কয়েকদিন পরে, হাতল-যুক্ত একটি লেন্সের সাহায্যে জলের উপরি-তল ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে, খুব ছোট ছোট অনেকগুলি বস্তু জলের উপরে ভাসিতে দেখা যাইবে—ইহারাই মশার ডিম। ডিমগুলি পরস্পর পৃথকভাবে থাকিলে, উহারা অ্যানোফিলিসের ডিম, আর দলবদ্ধভাবে ভাসিলে কিউলেক্সের ডিম বুঝিতে হইবে।

শূক—দুই-তিন দিন পরে গামলার জল লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, জলের মধ্যে অনেক সরু ও লম্বাটে ছোট ছোট পোকার মতো বস্তু জলে কিলবিল করিতেছে। ইহারা মশার শূক বা লার্ভা। পর পর কয়েকদিন লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, শূকগুলি ক্রমেই বড় হইতেছে। আট-দশ দিন পরে ইহারা



71 নং চিত্র—মশার জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশা (বাঁদিকে কিউলেক্স, ডানদিকে অ্যানোফিলিস) ; ক ও ক´ ডিম, খ ও খ´ লার্ভা, গ ও গ´ পিউপা, ঘ ও ঘ´ সমঙ্গ।

প্রায় এক সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ইহাদের দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদর—এই তিনটি প্রধান খণ্ডে বিভক্ত। উদরে আবার নয়টি দেহ-খণ্ডক থাকে। যদি দেখা যায় যে, শান্ত অবস্থায় শূকগুলি জলের উপরি-তলের সঙ্গে দেহকে প্রায় সমান্তরাল করিয়া আছে, তবে বুঝিতে হইবে, ইহারা অ্যানোফিলিসের শূক ;

আর যদি দেহকে জলের উপরি-তলের সঙ্গে 45° কোণ করিয়া জলের মধ্যে ঝুলিয়া থাকে, তবে উহারা কিউলেক্সের শূক।

পুত্তলি—আরও কয়েকদিন পরে জলের মধ্যে শূকের পরিবর্তে ইংরেজী 'কমা'-চিহ্নের মতো আকার-বিশিষ্ট অনেকগুলি বস্তুকে জলে নড়াচড়া করিতে দেখা যাইবে। ইহারা মশার পুত্তলি। ইহাদের দেহের অগ্র-ভাগের মোটা অংশ, বস্তুতঃপক্ষে, মস্তক ও বক্ষ মিলিয়া সৃষ্টি হয় এবং উদর অংশ ঐ মোটা অংশের দিকে বাঁকিয়া থাকে। মশার পুত্তলি সৃষ্টি হওয়ার পর, গামলাটিকে এক টুক্‌রা মশারির কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে।

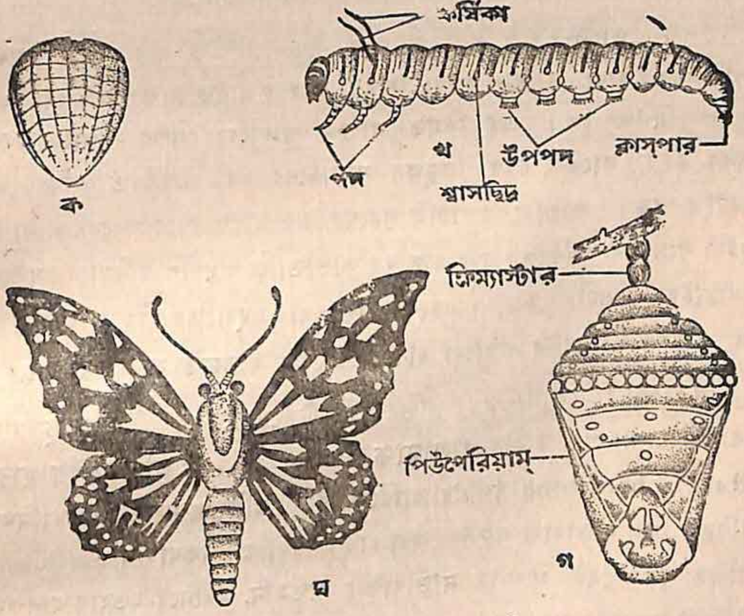
সমঙ্গ—দিন কয়েক পরে দেখা যাইবে যে, গামলার জলের উপরে মশা উড়িতেছে। পরিণত মশাই সমঙ্গ। ইহারা পুত্তলি হইতে সৃষ্টি হয়। মশার দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদর—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। মশার মস্তকে পুঞ্জাক্ষি ও মুখোপাঙ্গ থাকে। বক্ষের দুই পাশের সঙ্গে যুক্ত তিন জোড়া পদ এবং পৃষ্ঠদেশে দুই জোড়া ডানা থাকে—পিছনের ডানা জোড়াটি ক্ষয়প্রাপ্ত। যদি মশার দেহ বসার স্থানের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে থাকে, তবে উহা কিউলেক্স, আর দেহ বসার স্থানের সঙ্গে সূক্ষ্মকোণে থাকিলে, উহা অ্যানোফিলিস মশা। ইহা ছাড়া, অ্যানোফিলিস মশার ডানায় সাদা-কালো দাগ থাকে।

প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশা সংগ্রহ (Collection of life-history stages of butterfly)

ডিম—নানাধরনের প্রজাপতি বিভিন্ন উদ্ভিদের (যেমন—আকন্দ, করবী, কচু প্রভৃতি) পত্রের নিম্নতলে ডিম পাড়ে। এই সমস্ত পত্রের নিম্নতল পর্যবেক্ষণ করিলে, পত্রের গায়ে পোস্ত-দানার মতো কতকগুলি বস্তু লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়—ইহারাই প্রজাপতির ডিম। ইহারা সাধারণতঃ ডিম্বাকার অথবা গোলাকার, এবং হাল্‌কা হলুদ রঙের অথবা সাদাটে। প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশা সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ করিতে হইলে, প্রজাপতির ডিম-যুক্ত এইরকম পত্রসহ একটি ছোট পল্লব কাটিয়া আনিয়া, পল্লবটিকে একটি বড় জারের মধ্যে রাখিয়া, উহার মুখে এক টুক্‌রা পাতলা কাপড় বাঁধিয়া দিতে হইবে।

শূক—ছয়-সাত দিন পরে দেখা যাইবে, পত্রের গায়ে কয়েকটি ছোট ছোট পোকার মতো প্রাণী অনবরত পাতা খাইয়া চলিয়াছে। ইহারাই প্রজাপতির শূক। শূক বাহির হওয়ার পর, প্রতিদিন যে গাছে ডিম পাড়িয়াছে, তাহার বেশ কয়েকটি করিয়া পাতা খাইতে দিতে হইবে। তিন-চার সপ্তাহ ধরিয়া

এইরকম পাতা খাওয়াইতে হইবে। শূক ক্রমাগত পাতা খায় এবং চারবার খোলস-ত্যাগ করে। প্রতিবার খোলস-ত্যাগের আগে ইহারা কয়েক ঘণ্টা খাওয়া বন্ধ করে এবং খোলস-ত্যাগের পর আকারে বড় হয়। প্রজাপতির শূকের দেহ লম্বাটে, এবং মস্তক, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত ; বক্ষে তিন জোড়া **পদ**, উদরে চার জোড়া **উপপদ** এবং শেষ দেহ-খণ্ডকে একজোড়া **ক্লাস্‌পার** (**Claspers**) থাকে। দেহের দুই পাশে কয়েকটি শ্বাসছিদ্রও দেখা যায়। অনেক



72 নং চিত্র—প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশা ;
ক. ডিম ; খ. লার্ভা ; গ. পিউপা ; ঘ. সমঙ্গ।

প্রজাপতির শূকের গায়ে শুঁয়া থাকে বলিয়া, ইহাদের **শুঁয়াপোকা** (**Caterpillar**) বলা হয়। আবার, অনেক প্রজাপতির শূকের দেহে শুঁয়া থাকে না। ইহাদের বক্ষের পৃষ্ঠদেশে একজোড়া **কর্ষিকা** (**Tentacles**) থাকে।

পুত্তলি—শেষবার খোলস-ত্যাগের চার-পাঁচ দিন পরে শূকগুলিকে চুপচাপ পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইবে। ক্রমে নিষ্ক্রিয় শূকের চারদিকে **পিউপেরিয়াম** (**Puparium**) নামের পাতলা আবরণ এবং উহার একদিকে **ক্রিম্যাস্টার** (**Cremaster**) নামের দড়ির মতো অংশ সৃষ্টি হয়। ক্রিম্যাস্টার পাতার সঙ্গে আট্‌কাইয়া থাকে। জীবন-বৃত্তান্তের এই দশাকে পুত্তলি বলে। পুত্তলি নড়াচড়া করে না বা খায় না।

সমঙ্গ—পুত্তলি সৃষ্টি হওয়ার এক সপ্তাহ পরে পিউপেরিয়াম ভেদ করিয়া সমঙ্গ প্রজাপতি বাহির হইয়া আসে। অন্যান্য পতঙ্গের মতো, প্রজাপতির দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত। ইহাদের বক্ষে তিন জোড়া পদ ও দুই জোড়া রঙিন ডানা থাকে।

শ্বসন ও সংবহনের উপর ব্যায়ামের প্রভাব (Effects of physical exercise on respiration and circulation)

পেশী-সঙ্কোচন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, পেশীতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন অক্সিজেনের দ্বারা জারিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল সৃষ্টি করে এবং শক্তি নির্গত হয়। এই নির্গত শক্তির সাহায্যে পেশীর সঙ্কোচন অর্থাৎ চলন হয়। কাজেই, বেশ কিছুক্ষণ সঙ্কোচনের পর পেশীতে অক্সিজেনের ঘাটতি পড়ে। অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণের জন্য বর্ধিত হারে শ্বসনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং অক্সিজেন-যুক্ত রক্ত খুব তাড়াতাড়ি ও বেশি পরিমাণে পেশীতে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য, সংবহনের হার অর্থাৎ হৃদ্‌ঘাতের হার বাড়িয়া যায়। নিচের সহজ পরীক্ষাটির সাহায্যে এবিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

পরীক্ষা : কোনও সুস্থ ব্যক্তিকে একটি চেয়ারে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসাইয়া রাখার পর, তাহার **নাড়ীঘাত** (Pulserate) এবং **শ্বাসকর্মের হার** (**Rate of breathing**) লিখিয়া রাখিতে হইবে। মণিবন্ধে মধ্যমা ও অনামিকা চাপিয়া ধরিয়া নাড়ীঘাত অনুভব করা যায়। মিনিটে যতবার নাড়ী (Pulse) স্পন্দিত হয়, সেই সংখ্যাই নাড়ীঘাত। তেমনি, মিনিটে যতবার শ্বাসকর্ম হয়, সেই সংখ্যাই শ্বাসকর্মের হার। ইহার পর, ঐ ব্যক্তিকে খুব জোরে 100 মিটার দৌড় করাইতে হইবে।

নিরীক্ষা : দৌড়ানো শেষ হওয়ার ঠিক পরেই, ঐ ব্যক্তিকে খুব জোরে জোরে শ্বাসকর্ম করিতে দেখা যাইবে। তখন, আবার তাহার নাড়ীঘাত ও শ্বাসকর্মের হার লিখিয়া, দৌড়ানোর আগেকার হারের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে, দৌড়ানোর আগের হারের চেয়ে পরের হার অনেক বেশি।

সিদ্ধান্ত : অতএব, এই পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, ব্যায়ামের সময় দ্রুত পেশীর সঙ্কোচন হয় এবং তাহার ফলে শ্বসন ও সংবহনের হার বাড়িয়া যায়।

অনুশীলনী

প্রথম পরিচ্ছেদ :

1. সালোকসংশ্লেষ কি ? উদ্ভিদেরা কিভাবে সালোকসংশ্লেষ করে, তাহা সংক্ষেপে লেখ।

2. সালোকসংশ্লেষে (ক) ক্লোরোফিল, (খ) সূর্যালোক, (গ) কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং (ঘ) জলের প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা বল। এই প্রক্রিয়ায় পত্ররন্ধ্রের ভূমিকা কি ?

3. জীব-জগতে সালোকসংশ্লেষের গুরুত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

4. শ্বসন বলিতে কি বোঝায় ? উদ্ভিদেরা কিভাবে শ্বসন করে, তাহা লেখ।

5. নিম্নলিখিত প্রাণীগুলি কিভাবে শ্বসন করে, তাহা সংক্ষেপে লেখ :—

(ক) অ্যামিবা, (খ) কেঁচো, (গ) আরসোলা, (ঘ) স্থল-শামুক, (ঙ) মাছ, (চ) কুনো ব্যাঙ, (ছ) টিক্‌টিকি, (জ) পাখি, (ঝ) ইঁদুর।

6. সংক্ষেপে মানুষের শ্বসন বর্ণনা কর।

7. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

(ক) খাদ্য-শৃঙ্খল, (খ) শ্বাসযন্ত্র, (গ) শ্বাসনালী, (ঘ) ফুলকা, (ঙ) ফুস্‌ফুস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

1. খাদ্য কি ? বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের প্রকৃতি, উৎস এবং উপযোগিতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

2. রক্ষী খাদ্য কাহাদের বলা হয় ? মানুষের কি কি রক্ষী খাদ্য প্রয়োজন এবং উহাদের অভাবে কি ক্ষতি হইতে পারে, লেখ।

3. পুষ্টি বলিতে কি বোঝায় ? উদ্ভিদেরা কি কি উপায়ে পুষ্টিসাধন করে, তাহা বল।

4. নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির পুষ্টি সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ :—

(ক) অ্যামিবা, (খ) হাইড্রা, (গ) চ্যাপ্টা কৃমি, (ঘ) কেঁচো, (ঙ) কুনো ব্যাঙ।

5. মানুষের দেহে বিভিন্ন খাদ্যের পরিপাক, শোষণ ও আত্তীকরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

6. মানুষের দেহের তিনটি প্রধান পরিপাক-উৎসেচকের নাম লেখ এবং খাদ্য পরিপাকে উহাদের ভূমিকা বর্ণনা কর।

7. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

(ক) খাদ্য, (খ) ভাইটামিন, (গ) পুষ্টি, (ঘ) হলোফাইটিক পুষ্টি, (ঙ) হলোজোয়িক পুষ্টি, (চ) পরিপাক-উৎসেচক, (ছ) লালাগ্রন্থি, (জ) বিষম লাগা, (ঝ) ক্রমসঙ্কোচ, (ঞ) পরজীবীয় পুষ্টি, (ট) মৃতজীবীয় পুষ্টি, (ঠ) বিপাক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

1. সংবহন কাহাকে বলে ? ইহার প্রয়োজনীয়তা কি ? সংক্ষেপে উদ্ভিদ-দেহে সংবহনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

2. নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির কোন্‌টির হৃৎপিণ্ডে কয়টি করিয়া প্রকোষ্ঠ থাকে :—

(ক) রুইমাছ, (খ) কুনো ব্যাঙ, (গ) কুমির, (ঘ) পায়রা, (ঙ) ইঁদুর। এই সমস্ত প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া সংবহনের পদ্ধতি বর্ণনা কর। প্রয়োজনীয় চিত্র অঙ্কন কর।

3. মানুষের হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া সংবহনের সচিত্র সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

4. চিত্রসহ মানুষের রক্তের গঠন ও তাহার কাজ সম্বন্ধে লেখ।

5. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

(ক) রসের উৎস্রোত, (খ) হিমোগ্লোবিন, (গ) ধমনী, (ঘ) রক্ত-জালক, (ঙ) শিরা, (চ) লসিকা, (ছ) রক্তের তঞ্চন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

1. উদাহরণ ও চিত্রসহ উদ্ভিদের (ক) ফোটোট্রপিজ্‌ম, (খ) জিওট্রপিজ্‌ম, (গ) হাইড্রোট্রপিজ্‌ম এবং (ঘ) ন্যাস্টিক চলন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

2. গমনের সংজ্ঞা লেখ। (ক) স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বসবাসকারী চ্যাপ্টা কৃমি, (খ) কেঁচো এবং (গ) জোঁক যেভাবে গমন করে, তাহাদের সচিত্র বর্ণনা দাও।

3. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

(ক) প্রোটোপ্লাজ্‌মের চলন, (খ) এককোষী জীবের গমন, (গ) ফোটোট্রপিজ্‌ম, (ঘ) জিওট্রপিজ্‌ম, (ঙ) হাইড্রোট্রপিজ্‌ম, (চ) পেশী-সঙ্কোচন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :

1. রেচন বলিতে কি বোঝায় ? উদ্ভিদেরা কিভাবে রেচন করে ? উদ্ভিদের রেচনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কি ?

2. নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির রেচন-পদ্ধতি এবং রেচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গঠনাদির সংক্ষিপ্ত ও সচিত্র বর্ণনা দাও :—

(ক) অ্যামিবা, (খ) চাপ্টা কৃমি, (গ) কেঁচো, (ঘ) আরসোলা, (ঙ) কুনো ব্যাঙ।

3. মানুষের রেচন-পদার্থগুলির নাম লেখ। ইহারা কোথায় উৎপন্ন হয় এবং কিভাবে, কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায় ?

4. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

(ক) উদ্ভিদের রেচন-পদার্থ, (খ) সঙ্কোচী ভ্যাকুওল, (গ) ফ্লেম কোষ, (ঘ) ম্যাল্‌পিজিয়ান টিউবুল, (ঙ) বৃক্ক, (চ) মূত্র-প্রস্তুতি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :

1. মৃত্তিকা কাহাকে বলা যায় ? প্রধান তিন রকমের মৃত্তিকার গঠন, ধর্ম ও উপযোগিতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

2. জীবাণু কাহাদের বলে ? ইহাদের গঠনগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক ও উপকারী কয়েকটি জীবাণুর নাম কর এবং ইহারা কি ক্ষতি ও উপকার করে, তাহা লেখ।

3. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

(ক) বোদ, (খ) নাইট্রোজেন-স্থিতিকারী জীবাণু, (গ) নির্বীজন, (ঘ) ভাইরাস।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ

1. উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস এবং পটাশিয়ামের ভূমিকা নির্ধারণের জন্য একটি সহজ পরীক্ষা বর্ণনা কর।

2. উদ্ভিদের শ্বসনে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং অক্সিজেন শোষিত হয়, তাহা একটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ কর।

3. পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ কর যে সালোকসংশ্লেষের সময় অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয়।

4. কিভাবে আরসোলার পৌষ্টিক নালী ব্যবচ্ছেদ করিবে তাহা বর্ণনা কর। এই প্রাণীর পৌষ্টিক নালীর চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

5. কিভাবে কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্র ব্যবচ্ছেদ করিবে, তাহা বর্ণনা কর। ইহার পৌষ্টিক তন্ত্রের পরিচ্ছন্ন ও চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

6. মশা অথবা প্রজাপতির জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশা সংগ্রহ ও প্রতিপালনের বিষয়ে যাহা জান লেখ।

7. শ্বসন ও সংবহনের উপর ব্যায়ামের প্রভাব কি? ইহা নির্ধারণের জন্য একটি সহজ পরীক্ষা বর্ণনা কর।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (Objective Tests)

(ক) নিচের বক্তব্যগুলির যেটি ঠিক তাহার পাশে 'হ্যাঁ' লেখ, যেটি ভুল তাহার পাশে 'না' লেখ :—

(1) সালোকসংশ্লেষে সরল শর্করা প্রস্তুত হয়।
(2) শ্বসনের জন্য উদ্ভিদেরা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে।
(3) শ্বসনের প্রয়োজনে প্রাণীরা অক্সিজেন গ্রহণ করে।
(4) সব উদ্ভিদই সালোকসংশ্লেষ করিতে পারে।
(5) কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া সবুজ উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না।
(6) অক্সিজেন ছাড়া কোনও জীব বাঁচে না।
(7) সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খনিজ লবণ প্রয়োজন হয় না।
(8) ক্লোরোফিল ছাড়াও সালোকসংশ্লেষ সম্ভব।
(9) হলোজোয়িক পুষ্টিতে খাদ্য পরিপাক প্রয়োজন হয় না।
(10) লালার উৎসেচকের সাহায্যে প্রোটিনের পরিপাক হয়।
(11) সিক্রেটিন একরকম উৎসেচকের নাম।
(12) বৃহদন্ত্রে উৎসেচক নিঃসৃত হয় না।
(13) মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে।
(14) জোঁক লুপিং পদ্ধতিতে গমন করে।
(15) কেঁচো বৃক্কের সাহায্যে রেচন করে।
(16) ভাইরাসের কোষকে নিউক্লিওক্যাপসিড বলে।
(17) প্রজাপতির লার্ভা জলে থাকে।

(খ) দুই-এক কথায় উত্তর দাও :—

(1) সালোকসংশ্লেষের সময় উদ্ভিদ যে গ্যাস গ্রহণ করে, তাহার নাম কি ?

(2) শ্বসনের জন্য জীব কোন্ গ্যাস গ্রহণ করে ?

(3) পরজীবী জীব যে জীবের দেহ হইতে খাদ্য শোষণ করে, তাহাকে কি বলা হয় ?

(4) কার্বোহাইড্রেট পরিপাকের ফলে কি উৎপন্ন হয় ?

(5) কোন্ ভাইটামিনের অভাবে রক্তশূন্যতা রোগ হয় ?

(6) ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডে কয়টি প্রকোষ্ঠ থাকে।

(7) অধিকাংশ শিরা কিরকম রক্ত বহন করে ?

(8) হিমোগ্লোবিন রক্তের কোথায় থাকে ?

(9) কোষের প্রোটোপ্লাজমে যে চলন দেখা যায়, তাহাকে কি বলে ?

(10) ব্যাঙের অগ্র-পদ বড় না পশ্চাৎ-পদ বড় ?

(11) কেঁচো যে পদ্ধতিতে গমন করে, তাহার নাম কি ?

(12) ফ্লেম কোষ কোন্ প্রাণীর রেচন-যন্ত্র ?

(13) র‍্যাফাইড কোথায় পাওয়া যায় ?

(14) কোন্ মৃত্তিকাকে শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মৃত্তিকা বলা হয় ?

(15) কোন্ জীবাণু নাইট্রোজেন স্থিতি করিতে পারে ?

(গ) শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(1) সালোকসংশ্লেষের সময় উদ্ভিদ —— গ্যাস গ্রহণ করে এবং —— গ্যাস ত্যাগ করে।

(2) শ্বসনের সময় জীব —— গ্যাস গ্রহণ করে এবং —— গ্যাস ত্যাগ করে।

(3) শ্বসনের ফলে জীবের শুষ্ক ওজন —— যায়।

(4) ——, —— এবং —— এই তিন ধরনের খাদ্যকে শক্তিপ্রদ খাদ্য বলে।

(5) ভাইটামিন D-এর অভাবে —— রোগ হয়।

(6) 'রাতকানা' রোগ হয় —— ভাইটামিনের অভাবে।

(7) গলাধঃকরণের সময় খাদ্য —— তে প্রবেশ করিলে বিষম লাগে।

(8) লাইপেজ —— বিশ্লিষ্টকারী উৎসেচক।

(9) —— উদ্ভিদরা গলিত ও পচনশীল জৈব পদার্থ হইতে খাদ্য-সংস্থান করে।

(10) উদ্ভিদের —— মধ্য দিয়া জল ও খনিজ পদার্থের দ্রবণ উপরের দিকে উঠে।

(11) কেঁচোর রক্তের রঙ ——।

(12) মানুষের —— রক্তকণিকা নিউক্লিয়াস্-বিহীন।

(13) অ্যামিবা —— সাহায্যে গমন করে।

(14) পেশীর সঙ্কোচনের সময় পেশীতে —— অ্যাসিড সৃষ্টি হয়।

(15) পতঙ্গের প্রধান রেচন-যন্ত্রের নাম ——।

(16) —— মাটিতে প্রচুর পরিমানে উদ্ভিদ অথবা প্রাণীর পচা-গলা দেহাবশেষ থাকে

(17) জীবাণুর দেহে পরজীবীদের নাম ——।